হাত বাড়ালেই
সুবিধা
Suvida
বর্ষ ১ সংখ্যা ১
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১
বর্ষা ৩০
ইলিশের পঞ্চব্যঞ্জন ■ বর্ষায় ষোড়শীর ফ্যাশন ■ বাঙ্গরিপোসি ভ্রমণ
শিশুর টিকা : কোনটা কখন ■ প্রচেত গুপ্তর গল্প ■ মেয়েরা কেমন প্রেমিক চায়

বর্ষার প্যাচপ্যাচে আবহাওয়ার যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে

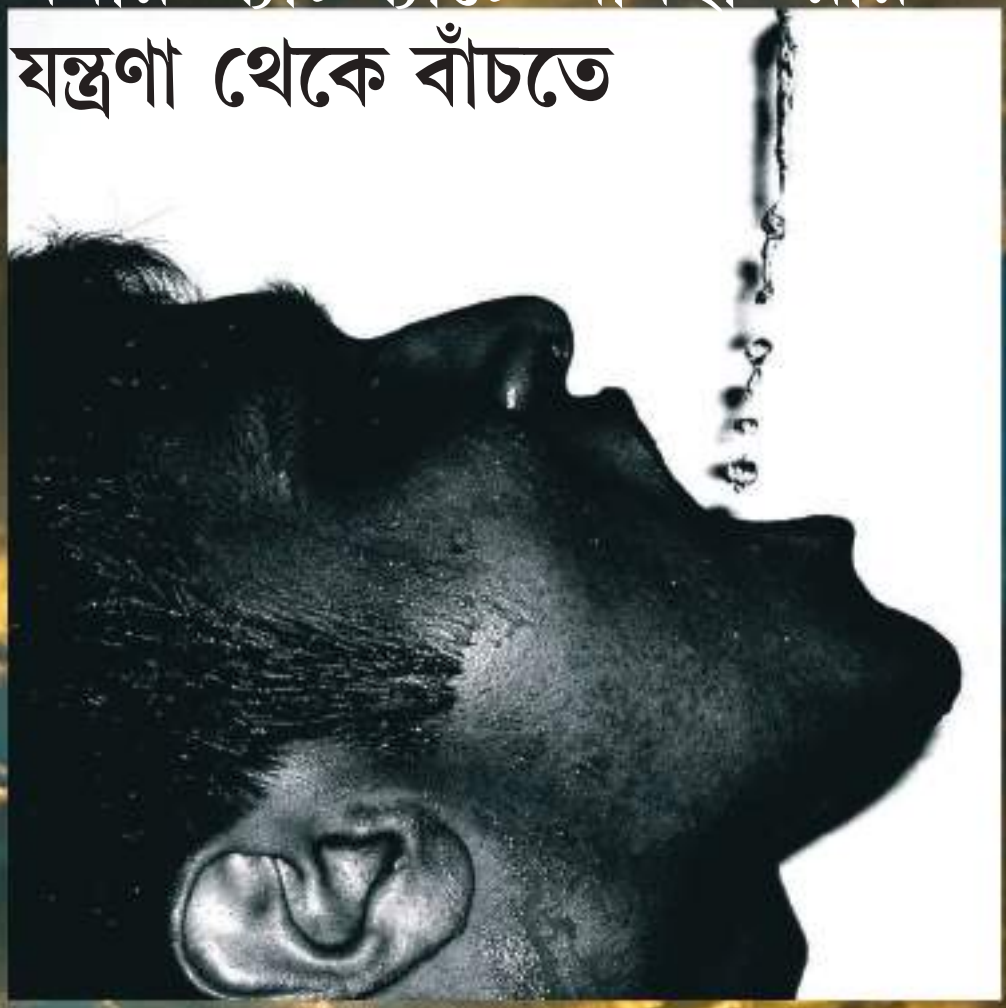

জল ছাড়াও আরও কিছু দরকার

হ্যাঁ, আপনার ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে দেখুন

Lacolite-Z™

To be administered on the advice/under the supervision of a qualified Medical Practitioner

সম্পাদক
সুদেষ্ণা রায়
মূল উপদেষ্টা
মাসুদ হক
সহকারী সম্পাদক
প্রীতিকণা পালরায়
শিল্প উপদেষ্টা
অন্তরা দে
প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী
সুনীল কুমার আগরওয়াল
মূল্য
১০ টাকা
মুদ্রণ
সত্যযুগ এমপ্লয়িজ
কো-অপারেটিভ ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল
সোসাইটি লিমিটেড
১৩, ১৩/১ এ
প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০৭২

আমাদের ঠিকানা
এসক্যাগ ফার্মা প্রা. লি.
পি ১৯২, লেকটাউন,
তৃতীয় তল, ব্লক - বি
কলকাতা ৭০০০৮৯
email-eskagsuvida@gmail.com

প্রচ্ছদ
সঞ্চারির ছবি তুলেছেন
অরিজিৎ দত্ত

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৪
শব্দজব্দ ৫
প্রচ্ছদ কাহিনি ৬
কথা ও কাহিনি ১১
হেঁশেল ১৬
তুমি মা ১৮
গৃহসজ্জা ২০
পোশাকি বাহার ২২
রূপচর্চা ২৪
বর্ষার উৎসব ২৭
কাছেদূরে ৩০
ডাক্তারের চেম্বার থেকে ৩২
মেয়েরা কেমন পুরুষ চায় ৩৪
আইনি ৩৬
সেলিব্রিটি সংবাদ ৩৮
সুলুকসন্ধান ৪০
ভূত-ভবিষ্যৎ ৪২

২৪ রূপচর্চা

সুগন্ধী থাকুন

ডাক্তারের চেম্বার থেকে

জরায়ুর ফাইব্রয়েড ৩২

পোশাকি বাহার ২২

বর্ষায় ষোড়শী

বিশেষ রচনা

২৭ বর্ষার উৎসব

হেঁশেল ১৬

ইলিশের পাঁচরকম

স ম্পা দ কী য়

প্রতি বছরই থাকে ঋতু বৈচিত্র্য। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির কাছে ইংরিজি ক্যালেন্ডার, ইংরিজি উৎসব গৃহীত হয়ে থাকলেও, ঋতুর ক্ষেত্রে বাঙালি জীবনে রয়েছে এখনও ছ'টি বৈচিত্র্য। তার মধ্যে বর্ষার স্থান অন্যতম। বর্ষা মানেই বাঙালি মননে আশা। কারণ কৃষি নির্ভর গ্রামে বর্ষাই আনে সমৃদ্ধির বার্তা। অবশ্য সেই বর্ষাই হয়ে উঠতে পারে ভয়ঙ্করীও, যেমন হয়ে ওঠে আপনার প্রেমিকাও মাঝে মাঝে! কিন্তু তাতে কী তার সৌন্দর্য বা আকর্ষণ কমে যায়? বর্ষার যতই নেগেটিভ দিক থাকুক না কেন, তার ইতিবাচক দিকটার পাল্লা অনেক ভারী! জলকাদা হলেও বর্ষা আনে স্বস্তি।

চিঠি চাই চাই মতামত

চিঠি লিখুন, জিতুন ১০০০ টাকা

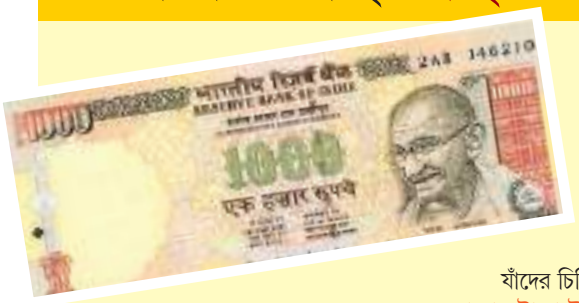

সুবিধার প্রথম সংখ্যা এটি। এই পত্রিকার সাফল্য আপনাদের হাতে। তাই বলছি কী বন্ধু, চাই আপনাদের সহযোগিতা, পত্রিকাটিকে আরও সুন্দর করে তুলতে। চিঠি লিখে বা ই-মেল করে জানান এই পত্রিকার কী ভাল, কী খারাপ! যাঁদের চিঠি আমরা আমাদের এই পত্রিকায় প্রথম চিঠি হিসেবে ছাপাব তাঁদের দেওয়া হবে **হাজার টাকা উপহার**! এ ছাড়া প্রথম ১০০টি চিঠির প্রেরককে দেওয়া হবে ৫০০টাকা করে পুরস্কার। চিঠির সঙ্গে আমাদের দেওয়া কুপনটি ভরে পাঠাবেন। ধন্যবাদ

আমাদের ঠিকানা
সম্পাদক, সুবিধা
প্রযত্নে : এসক্যাগ ফার্মা প্রাঃ লি,
পি ১৯২, লেকটাউন, তৃতীয় তল, ব্লক বি কলকাতা : ৭০০০৮৯
email : eskagpha@vsnl.com

নাম .....বয়স.....

ঠিকানা .....

কী করেন .....

আমরা গ্রীষ্মের প্রকোপে যখন ত্রাহি ত্রাহি করছি তখন মেঘ ভেঙে আসে যে জল, তা আমাদের তপ্ত শরীরকে শান্ত করে। ধুয়ে দেয় কালিমা, প্রকৃতি স্নান করে ঝলমলিয়ে ওঠে। তাই বর্ষাকে কেন্দ্র করে রয়েছে অসংখ্য উৎসব, কবিতা, গান। সুবিধার তরফ থেকে বর্ষাকে উপভোগ্য করে তুলতে আমাদের নিবেদন 'বর্ষা ৩০'। বর্ষার স্তুতি শুধু নয়, বর্ষা নিয়ে নানা বিভাগে নানা বিষয়ে রয়েছে রচনা আপনাদের জন্য। বর্ষা মঙ্গল হোক আপনাদের।

বর্ষা মঙ্গলের কথায়, মনে পড়ে গেল, ছোটবেলায় স্কুলে থাকাকালীন বর্ষা মঙ্গল উদযাপন। রবীন্দ্রনাথের গান ও রচনা কেন্দ্র করেই গড়ে উঠত আমাদের বর্ষামঙ্গল উৎসব। দেখে ভাল লাগে, যে আজও স্কুল, কলেজে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান হয়, আর রবীন্দ্রনাথ সেই উৎসবে সেরার আসনেই থাকেন। তাঁর সার্ধ শতবর্ষে, কবিগুরুকে নিয়ে নানা কিছু হচ্ছে ঠিকই, আর বাঙালি অনবরত গেল গেল রব তুললেও, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এখনও আমাদের মননে, আমাদের হৃদয়ে, আমাদের উৎসবে রয়েছেন। তাঁকে ঘিরে এখনও আমরা আনন্দ করি, দুঃখ পাই, প্রেম করি। তিনি না থাকলে কত কথাই যে না বলা থেকে যেত। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সার্ধ শতবর্ষে আমাদের শতকোটি প্রণাম!

সুদেষ্ণা রায়,
সম্পাদক

শব্দজব্দ ১ বর্ষা শ্যামদুলাল কুণ্ডু

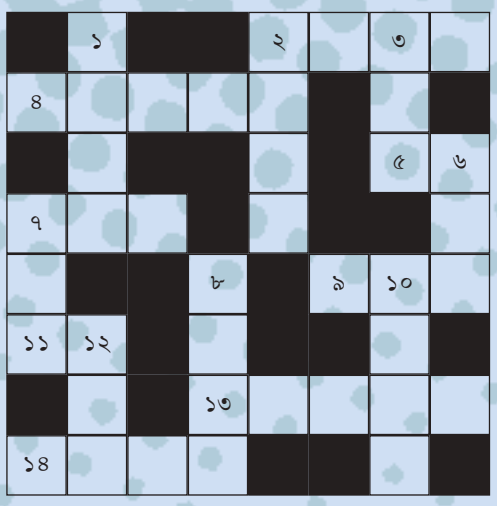

পাশাপাশি

২। শিশির রজনিজল, সৈয়দ মুজতবা আলির অন্যতম গ্রন্থ। ৪। ভূর্জপাতায় নবগীত করো রচনা/— রাগিণী'। ৫। ঘন গৌরবে—যৌবনা বরষা'। ৭। সুন্দরবনের এ নদীটি বর্ষায় আরও ভয়ংকর। ৯। এর তো জলে,-জলেই জীবন কাটে, বর্ষাতেও রেহাই নেই। ১১। বাড়ির ঘাসে ঢাকা চত্বরটা বৃষ্টির জলে রোদে ঝকঝক করে। ১৩। বর্ষায় শান্তিনিকেতনের উৎসব। ১৪। '—এ গান'! হ্যাঁ বর্ষার।

উপরনিচ

১। আষাঢ়ের প্রথম দিনে এক প্রিয়া বিরহ সন্তপ্তকে নিয়ে মহাকবির এক কাব্য। ২। প্রবল বর্ষায় এদের দেখাশোনা করার দায় সরকারের। ৩। 'আজ—মেঘের সুর লেগেছে আমার মনে'। ৬। যা বর্ষাকালে হয়, বর্ষা সংক্রান্ত। ৭। 'বাদল মেঘে— বাজে গুরু গুরু গগন-মাঝে'। ৮। বর্ষায় নাকি ভয়ংকর সুন্দর 'মানস—'। ১০। বর্ষায় এরা ডানা মেলে উড়তে পারে না, বড় কষ্ট। ১২। 'ও গো কী ভাবিয়া মনে এ দু'টি নয়নে উথলে—বারি'।

সমাধান শব্দজব্দ ১

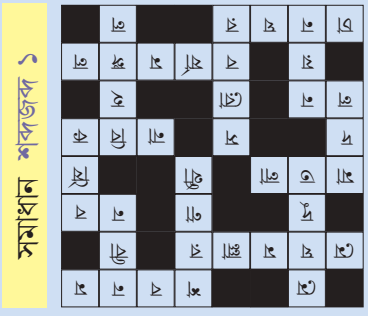

বর্ষা ৩০

বর্ষা যেমন সুন্দর, যেমন রোমাঞ্চকর, যেমন প্রয়োজন, তেমনই আবার বৃষ্টিপাত সঙ্গে নিয়ে আসে কিছু সমস্যা। বর্ষার নানা সমস্যা লাঘব করে, কীভাবে এই ঋতুকে উপভোগ্য করে তুলবেন তার হালহদিস দিচ্ছেন সুবিধার সম্পাদকীয় টিম। তাতে রয়েছেন **সুদেষ্ণা রায়, সুমন ভাদুড়ী, সাবর্ণী দাস, প্রীতিকণা পালরায় ও কাকলি চক্রবর্তী**

১ **যখনই রোদ উঠবে তখনই** জানলা দরজা সব খুলে রাখবেন। রোদ, আলো ঘরে ঢুকলে ভ্যাপসাভাব কমবে।

২ **কেউ যদি যে কোনও** ধরনের এসেনশিয়াল অয়েল ব্যবহার করেন তাহলে সেগুলোও ইতিউতি ছড়িয়ে দিতে পারেন। সামান্য ফুটন্ত জলে কয়েক ফোঁটা এসেনশিয়াল অয়েল দিয়ে ঘরের মধ্যে রাখুন।

৩ **বর্ষার সময় এমনিতেও ঘরের মধ্যে ভিজেভাব ও ড্যাম্পের ভ্যাপসা** গন্ধ হয়। এই গন্ধ তাড়াতে পটপউরি (শুকনো ফুল-পাপড়ি, দোকানে কিনতে পাওয়া যায়) রাখতে পারেন টেবিলে। গোলাপ ফুল সাজানো থাকলে পুরনো হলে ফেলে না দিয়ে পাঁপড়িগুলো একটা প্লেটে রাখতে পারেন।

৪ **ধরুন এসব কিছুই হাতের কাছে** নেই। তাহলেও ড্যাম্পের গন্ধ থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় আছে। বাড়িতে গরম মশলা, জিরে, ধনে কিছু না কিছু তো আছে। সেগুলো একটা কাপে বা বাটিতে দিয়ে ঘরে রাখুন। দরজা জানলা বন্ধ করে রাখুন। পরের দিন সকালে মশলাটা ফেলে দিন।

৫ **পুরনো মোজা যেটা আর** ব্যবহার করবেন না, সেটি কেচে শুকিয়ে তার মধ্যে তাজা কফি ভরে আলমারির মধ্যে টাঙিয়ে দিন। জামাকাপড়ে ড্যাম্পের গন্ধ হবে না।

৬ **জুতোর র‍্যাকে সারারাত** একটা বালব জ্বালিয়েও রাখতে পারেন। ভিজেভাব কমবে। ছাতা ধরবে না।

৭ **সিলিকা জেল-এর** প্যাকেট চামড়ার ব্যাগেও ভরে রাখতে পারেন। ব্যাগে ফাঙ্গাস ধরবে না। যখনই রোদ উঠবে ব্যাগ-জুতো সব রোদে দেবেন।

৮ সুগন্ধি মোমবাতি খানিকক্ষণ জ্বালিয়ে রাখলে ড্যাম্প-এর গন্ধ দূর হবে।

৯ **বাড়ির মধ্যে অনেক কোণ** বা জায়গা থাকে যেখানে আমরা জিনিসপত্র জমা করে রাখি—পুরনো খবরের কাগজ, অব্যবহৃত আসবাব, গদি-তোষক-বালিশ ইত্যাদি। এগুলো নিয়মিত ঝাড়ামোছা হয় না। ফলে বর্ষকালে ড্যাম্প-এর গন্ধ আসে। এইসব জায়গায় ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দিন। আধঘণ্টা পরে ঝাঁট দিয়ে ব্লিচিং পাউডার তুলে কাগজে মুড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিন।

১০ **বর্ষায় জুতোর অবস্থা** বেহাল হয়ে পড়ে। যদি বর্ষায় রবারের জুতোও পরেন, তাহলেও চামড়ার জুতোগুলোতে ফাঙ্গাস ধরে। জুতো রাখার জায়গায় সিলিকা জেল প্যাকেট করে রাখুন।

১১ গরমের পর বর্ষায় কিছুটা স্বস্তি পেলেও, আচমকা সিজন চেঞ্জ-এ নানারকম সমস্যাও দেখা দেয়। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় সর্দি-কাশি-ঠাণ্ডা লাগা যেমন আছে, তেমনই আছে পেটের অসুখ। একই সঙ্গে নানারকম ইনফেকশন এর সম্ভাবনাও বেড়ে যায় খুব।
অসুখে পড়লে চিকিৎসকের সাহায্য না নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু যেটুকু আমাদের হাতে আছে তা হল সাবধানতা অবলম্বন। এবং এর বেশিটাই হল খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া আর কিছু টোটকা আগাম ব্যবহার করা।
প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো এবং শরীরে এনার্জি সরবরাহ করাটা খুব জরুরি এসময়ে। এসব ক্ষেত্রে ফল আপনাকে বরাবরের মতো এসময়েও সাহায্য করবে। বিশেষত পেঁপে, কলা, পিচের মতো ফল নিয়মিত খেলে অসুখে পরা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন। এছাড়া হার্বাল টি শরীরে প্রচুর এনার্জি সরবরাহ করে।

১২ আদা, পেঁয়াজ, হলুদ, দারচিনি, পুদিনা পাতার মতো কিছু মশলা ও হার্বস ঠাণ্ডা লাগা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। বিশেষত হলুদ অ্যালার্জি প্রতিরোধ করে এবং অ্যান্টিসেপটিকের কাজ করে।

১৩ বর্ষার জমা জল, রাস্তার কাদা পায়ে লেগে নানা ধরনের ইনফেকশন হয়। বাইরে থেকে এলে পা পরিষ্কার করা যতটা জরুরি ততটাই প্রয়োজন, ঈষদষ্ণ জলে মিনিট দশেক পা ডুবিয়ে রাখা। একই সঙ্গে চায়ের মধ্যে দারচিনি মিশিয়ে খেলে ভাল। কারণ দারচিনি এধরনের ইনফেকশন প্রতিরোধে সাহায্য করে।

১৪ এসময়ে ঠাণ্ডা লাগার একটা ধাত থেকেই যায়। তুলসী পাতা বাটা, থেঁতো করা আদা এবং গুড় দিয়ে ছোট ছোট বড়ি বানিয়ে দিনে তিন থেকে চারবার খান।

১৫ পেটের গোলমাল সামলানোর দুটো প্রধান উপায়, এসময় বাইরের খাবার, বিশেষত জল খাওয়া বন্ধ করা, সেইসঙ্গে বাড়িতেও ভাজাভুজি ও মশলাদার খাবার খাওয়া বন্ধ করা। জল ফুটিয়ে খেলে খুব ভাল। রাত্রিবেলা জল ফুটিয়ে মৌরি ভিজিয়ে রাখুন। সকালে মৌরি ছেঁকে নিয়ে জলে মধু মিশিয়ে খান। যাঁদের ফিলটার বা অন্য ব্যবস্থা আছে তাঁরা এমনি জলে মৌরি ভিজিয়ে একই ভাবে খেতে পারেন।

১৬ প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে দুপুরের এবং রাতের খাবার খান। এছাড়া যেকোনও দুটো মিলের মধ্যে যেন কমপক্ষে তিন ঘণ্টার পার্থক্য থাকে। অনিদ্রা অনেক সময় হজমের গোলমাল ঘটায়। বেশি রাত পর্যন্ত না জেগে থাকাই ভাল। সকালে খালি পেটে এক গ্লাস ঈষদুষ্ণ গরম জল খান।

১৭ বর্ষার সময় আপনার গাড়ির দিকে, তা সে চারচাকাই হোক আর দু-চাকা, বিশেষ নজর দিতে হবে। এবং এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নজর দাবি করে আপনার গাড়ির ব্রেক। বর্ষাকালে গাড়ির ব্রেক ভিজে যায়, তখন তা যদি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করা হয়, তাহলে ব্রেক ঠিকমতো ধরতে চায় না। যার ফলে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। তাই বর্ষাকালে নিজের গাড়ির ব্রেক-শু এবং ড্রাম দুটোর অবস্থা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়াটা খুবই জরুরি। এর জন্য বর্ষাকালে, অন্তত দুবার গাড়ি সার্ভিসিং করা উচিত।

১৮ বর্ষার সময় গাড়ির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল চাকা। গাড়ি চলার সময় রাস্তার সঙ্গে ক্রমাগত ঘর্ষণের ফলে চাকার টায়ার একটু একটু করে ক্ষয়ে যেতে থাকে। বলা বাহুল্য যেসব গাড়ি বেশি চলে তার টায়ার আরও দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ক্ষয়ে গেলে টায়ারের রাস্তা আঁকড়ে ধরে রাখার ক্ষমতা কমে যায় এবং বর্ষার ভেজা রাস্তায় ঠিকমতো গ্রিপ না

১৯ বর্ষার সময় একটু বৃষ্টির জল গায়ে পড়ল কী না পড়ল অমনি অনেকের হাঁচি শুরু হয়ে যায়। নাক দিয়ে জল পড়ে, কানে ব্যথা শেষ পর্যন্ত হাঁপানি কত যে সমস্যা একে একে এসে হাজির হয় তার ইয়ত্তা নেই। অথচ এ সবের থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব কয়েকটি যোগাসন চর্চা করলেই। সর্দি-কাশি প্রতিরোধ করার জন্য যে আসনগুলো খুবই কার্যকর সেগুলো হল ভূজঙ্গাসন, সর্বাঙ্গাসন, হলাসন, মৎস্যাসন, বদ্ধ পদ্মাসন, উষ্ট্রাসন, উড্ডীয়ান, কপালভাতি ইত্যাদি। তবে সবার জন্য সব আসন উপযুক্ত নাও হতে পারে। কার জন্য কোনটা উপযুক্ত তা নির্ধারণ করতে পারেন একমাত্র অভিজ্ঞ যোগ প্রশিক্ষকই। অন্যথায় হিতে বিপরীত হতে পারে। একথা বলেছেন ওয়ার্ল্ড যোগ সোসাইটির অধ্যক্ষ ডঃ দিব্যসুন্দর দাস।

এবার জেনে নিন ২-১টি আসন করার পদ্ধতি।

সর্বাঙ্গাসন

চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। পা দুটো জোড়া করে ওপরে তুলুন। দু হাতের চেটো দিয়ে পিঠ ঠেলে ধরুন এমনভাবে যেন ঘাড় থেকে পা পর্যন্ত সব এক সরলরেখায় থাকে। চিবুক লেগে থাকবে বুকের সঙ্গে। দৃষ্টি থাকবে পায়ের আঙুলের দিকে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে মনে মনে দশ থেকে তিরিশ গুনুন। শবাসনে বিশ্রাম নিন। তিনবার এটা করুন। সর্দিকাশি, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি, টনসিল সারাতে খুবই কার্যকর এই আসন। ফ্যারিঞ্জাইটিসএও এটি মহার্ঘ ওষুধের কাজ দেয়।

বদ্ধ পদ্মাসন

পদ্মাসনে বসে দু হাত পিছন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল ডান হাত দিয়ে এবং বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল বাঁ হাতে

পাওয়ার ফলে গাড়ি স্কিড করতে পারে। তার ফলে ঘটতে পারে মারাত্মক দুর্ঘটনা। তাই বর্ষার আগে নিজের গাড়ির চাকা পরীক্ষা করিয়ে নিন এবং যদি চাকা একেবারে ক্ষয়ে গিয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই বদলে নিন।

২০ এবার আসা যাক গাড়ির ওয়াইপারের কথায়। বর্ষার আগে গাড়ির ওয়াইপারগুলো পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। কখনও কখনও দেখা যায় ওয়াইপারের রবারগুলো শক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে সেগুলো ঠিকমতো জল কাটাতে পারছে না। সেক্ষেত্রে এই রবারের গায়ে খানিকটা তেল দিয়ে রবারগুলো নরম করে নিতে পারেন। আর যদি দেখা যায় তাতেও কাজ হচ্ছে না, তাহলে ওয়াইপারের রবারগুলো বদলে নেওয়াটাই ভাল।

২১ এবার একটা টোটকা শিখিয়ে দিই। এটা বিশেষ করে তাদের জন্যে বলছি যাদের বর্ষাকালে লম্বা সফরে বেরোতে হয় গাড়ি করে অথবা যারা হাইওয়ে দিয়ে যাতায়াত করেন। হঠাৎ যদি কোনও কারণে বৃষ্টির সময় চলন্ত গাড়ির ওয়াইপার কাজ করা বন্ধ করে দেয় তখন বৃষ্টির জল সামনের কাঁচে পড়ে সহজে নেমে যেতে চায় না। অনবরত বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে পড়তে কাঁচের ওপর ছোপ ছোপ দাগ হয়ে গিয়ে কাঁচটাকে ঝাপসা করে দেয়। সেক্ষেত্রে খানিকটা তামাক (সিগারেটেরও হতে পারে) নিয়ে সেটা কাঁচের ওপর বেশ করে ঘষে দিন, দেখবেন বৃষ্টির জল আর কাঁচের ওপর দাড়াবে না।

২২ এবার আসা যাক প্রয়োজন থেকে অতি প্রয়োজনে। বর্ষার সময় বিশেষ নজর দিতে হবে অন্দরমহলে ব্যবহৃত নিত্য প্রয়োজনের বৈদ্যুতিক জিনিসপত্রের দিকে। বাড়ির সবকটা ইলেকট্রিকের পয়েন্ট এবং বিদ্যুৎ-চালিত সব যন্ত্রের তার ভালভাবে পরীক্ষা করে নিতে হবে, যেন কোথাও কোনও লিক না থাকে। এই ধরনের লিক থেকে বর্ষাকালের স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় বৈদ্যুতিক শক খাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আরও একটি বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে বর্ষাকালে, বিশেষ করে তাঁদের, যাঁদের বাড়িতে এই মরসুমে দেওয়ালে ড্যাম্প বা ভিজে ভাব পড়ে, বা ঘরের কোনও অংশ থেকে বৃষ্টির জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে। এই ড্যাম্প পড়া জায়গাগুলোর আশপাশে যেন কোনও ইলেকট্রিকের যন্ত্র না চালানো হয় এবং চুঁইয়ে পড়া জল যেন কোনওমতেই কোনও ইলেকট্রিকের পয়েন্ট বা তারের সংস্পর্শে না আসে। হলেই কিন্তু বিপদ! বর্ষার আগে, পারলে এই ড্যাম্পভাব দূর করার চেষ্টা করুন।

২৩ এবার আসি শখের কথায়। যাঁরা ছবি তুলতে ভালবাসেন এবং নিজেদের ক্যামেরা আছে, তাঁদের বলি, বর্ষাকালে কিন্তু আপনাদের সখের ক্যামেরা এবং তার লেন্সগুলোর বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। বর্ষার স্যাঁৎস্যাঁতে আবহাওয়ায় ক্যামেরাটা বাইরে, খোলা অবস্থায় ফেলে রাখবেন না। প্রয়োজন বাদে ক্যামেরা এবং লেন্স ক্যামেরার ব্যাগেই রাখবেন। বর্ষাকালে ক্যামেরার ব্যাগে সিলিকা জেল (বাজারে কিনতে পাওয়া যায়) রাখা অত্যাবশ্যক। সিলিকা জেল আবহাওয়ার জলকণা শুষে নিয়ে ব্যাগের ভেতরকার আবহাওয়াটা শুকনো রাখে যাতে ক্যামেরা বা লেন্সে ছাতা না পড়তে পারে। ক্যামেরা সুস্থ থাকলে ছবিও সুস্থ উঠবে। বাইরে ব্যবহার করে ব্যাগে তোলার আগে ভাল করে দেখে নেবেন ক্যামেরায় যেন কোনও জলকনা না থাকে। পারলে নরম কাপড় দিয়ে মুছে নেবেন এবং লেন্স শ্যাময় লেদার বা নরম ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে তুলবেন।

২৪ বর্ষা মানে যেমন সবুজ গাছ, মেঘলা আকাশ, তেমনই আবার জল-কাদাও রয়েছে সঙ্গে। এই জল কাদা থেকে অনেক সময়ই ইনফেকশন হয়। তাই জল বা কাদা ঠেলে

ধরুন। মেরুদণ্ড সোজা রাখবেন। শ্বাসপ্রশ্বাস নিন স্বাভাবিকভাবে। ১০ সেকেন্ড থেকে বাড়িয়ে এক মিনিট পর্যন্ত আসনটা করে বিশ্রাম নেবেন।

এই আসনে হাঁপানি দূর হয়, শ্বাস জনিত অন্যান্য সমস্যা থেকেও এটি রক্ষা করে।

উষ্ট্রাসন

হাঁটু গেড়ে নিল ডাউনের ভঙ্গিতে বসুন। পিছনদিক হেলিয়ে দু হাত দিয়ে দু পায়ের গোড়ালি ধরে মাথা পিছনের দিকে ঝুলিয়ে আস্তে আস্তে পেটটা সামনের দিকে এগিয়ে দিন। ডান হাতের বুড়ো আঙুল ডান গোড়ালির ভিতর দিকে আর অন্যান্য আঙুলগুলো বাইরের দিকে থাকবে। একইভাবে বাঁ বুড়ো আঙুল বাঁ গোড়ালির ভিতরদিকে ও অন্যান্য আঙুলগুলো বাইরের দিকে থাকবে। পায়ের পাতা থাকবে মাটিতে পাতা। স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসে মনে মনে দশ গুণতে হবে। ক্রমশ এটা বাড়িয়ে তিরিশ পর্যন্ত গুনতে হবে। একবার করার পর শবাসনে বিশ্রাম নিয়ে তিনবার এরকম করবেন।

ব্রঙ্কাইটিস ও হাঁপানিতে এটি খুব ভাল কাজ দেয়।

ঘরে এলে, চেষ্টা করবেন জামা কাপড় সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে, তা অ্যান্টিসেপটিক জলে ধুয়ে ফেলতে। জুতো চামড়ার হলে তা মুছে পরিষ্কার করে ফাঁকা জায়গায় হাওয়ার তলায় রাখবেন। রোদ উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে রোদে দেবেন। বর্ষায় রোজ মোজা ও অন্তর্বাস কাচবেন, নয়তো দুর্গন্ধ আপনাকে অসামাজিক করে তুলতে পারে। স্নানের জলেও অল্প অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে নেবেন, এতে ত্বকের র‍্যাশের হাত থেকে মুক্তি পাবেন।

২৫ জল, বিশেষ করে যে জল খাওয়া হয়, তা পরিশোধন করেই খাবেন। ফিল্টার থাকলে সেটা ব্যবহার করুন। নতুবা সেই মা-ঠাকুমার যুগে ব্যবহৃত উপায় জল ফুটিয়ে কাপড়ে ছেঁকে খান। এমনকি টিউবওয়েল-এর জলও ফুটিয়ে খাবেন। বিশেষত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। এ সময় বাচ্চাদের খাবার, জল, শরীরের দিকে বিশেষ নজর দেবেন। পেটের অসুখ করলে সঙ্গে সঙ্গে তার চিকিৎসা করাবেন। সর্দি কাশি হলেও তা উপেক্ষা করবেন না।

২৬ বর্ষাকালে স্যাঁতস্যাঁতে ড্যাম্প আবহাওয়ার জন্য লোহার জিনিসে মরচে পড়ে যায়। তাই চেষ্টা করবেন বাড়ির জানলা বা লোহার জিনিসে এক কোট রং দিতে ঠিক বর্ষার শুরুতে। গাড়ি বা মোটরসাইকেল এর ক্ষেত্রেও সার্ভিস সেন্টার থেকে মর্চে নিরোধক একটা পেন্ট বা রং লাগিয়ে নিতে পারেন। এ সময় বাড়িতে রুপো বা পেতলের জিনিস থাকলে, দেখবেন তা কেমন নিষ্প্রভ হয়ে উঠছে। বৃষ্টি কমে এলে এগুলো পালিশ করে নিলেই আবার ঝকঝকে হয়ে যাবে।

২৭ বাড়িতে গাছ থাকলে, তা সে বাগান, ছাদ বা বারান্দা যেখানেই হোক না কেন, তার পরিচর্যা দরকার। এসময় সেগুলো জল পায় ঠিকই, কিন্তু দেখবেন যেন জল ঝরে যায়। মাটি বদলে, টবের গাছ আবার করে লাগাতে পারেন। বর্ষার আগে গাছের বড় ডাল বা পাতা একটু ছেঁটে নেবেন। নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করবেন।

২৮ এই সময় সাদা সুগন্ধী ফুলের আধিক্য দেখা দেয়। তাই পারলে সন্ধে বেলায় ঘরে জুঁই বা বেল মালা একটা বাটি করে রেখে দিন, দেখবেন ঘরটা কেমন স্নিগ্ধ সতেজতায় ভরপুর হয়ে উঠবে।

২৯ এই সময় নিয়ম করে সপ্তাহে একদিন রান্নাঘরের সব জিনিসপত্র নামিয়ে ঝেড়ে রাখবেন। কোথাও জল জমতে দেবেন না। জল জমা থাকলে, তার উপর একটু কেরোসিন বা কোনও ওষুধ যুক্ত ক্লেনজার ছড়িয়ে দেবেন। ঘর মোছার জলে একদিন অন্তর একটু কেরোসিন বা ইউক্যালিপটাস অয়েল (তেল) দিয়ে ঘর মুছলে, মেঝেও চকচক করবে আর মশাও কম হবে। জ্বর হলেই, দু একদিনের মধ্যেই রক্ত পরীক্ষা করে দেখে নেবেন ম্যালেরিয়া কিনা!

৩০ বর্ষা যতই সমস্যা আনুক, এই ঋতু উপভোগ্যও বটে। যদি বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়তে থাকে, ঘর বন্দী হয়ে থাকেন, তাহলে বাড়িতে সবাই মিলে রেঁধে ফেলুন খিচুরি, ডিমভাজা, ইলিশ মাছ ভাজা। বিকেলে সবাই মিলে খান মুড়ি তেলেভাজা, আর রাতে হালকা খাবার গরম স্যুপ, টোস্ট, বা পাস্তা। রাতে খাবার আগে, বাড়িতে বন্ধুরা মিলে বা বাড়ির সবাই মিলে মোমবাতির আলোয় বসে ভূতের গল্প শেয়ার করতে পারেন, বা বাড়িতেই ডিভিডিতে ছবি দেখতে পারেন। দেখবেন ঝমঝমে বর্ষা কেমন জমে উঠেছে। জয় বর্ষা, জয়!

শনিবার

প্রচেত গুপ্ত

এক শনিবার সন্ধেবেলা ঘটনাটা ঘটল। জনার্দনবাবু স্ত্রীকে ডেকে বললেন...।

জনার্দন সামন্ত এখন আর মর্নিংওয়াক করেন না। এক বছর আগেও জনার্দনবাবু মর্নিংওয়াক করতেন। পাক্কা দু' কিলোমিটার ঘাম ঝরিয়ে হাঁটতেন। তারপর বাজার সেরে, মোড়ের চায়ের দোকান থেকে মাঝারি সাইজের মাটির ভাঁড়ে চা খেয়ে বাড়ি ফেরা। দুধ এবং চিনি জনার্দনবাবুর জন্য নিষিদ্ধ। ভাঁড়-চায়ে তিনি দুটোই খেতেন। খাওয়ার সময় মনকে বোঝাতেন, মাটি অতি উপকারি বস্তু। যাবতীয় বিষ সে শুষে নিতে জানে। তার বেলাতেও নেবে। দুধজনিত 'অ্যাসিড' এবং চিনিজনিত 'সুগার'-এর বিষ তার গায়ে লাগতে দেবে না। মাটির ভাল নাম মৃত্তিকা না হয়ে হওয়া উচিত ছিল নীলকণ্ঠ।

জনার্দনবাবু মর্নিংওয়াক বন্ধ করলেও হাঁটা বন্ধ করেননি। মর্নিংওয়াকের বদলে তিনি এখন করেন ইভনিংওয়াক। সান্ধ্যভ্রমণ। ঠিক বিকেল আর সন্ধের মাঝামাঝি সময় পাড়ার পার্কে চক্কর দেন। গুনে গুনে ছাব্বিশ চক্কর। বছরখানেক আগে তিনি কোনও এক বিদেশি পত্রিকায় পড়েছিলেন, পঁয়ষট্টি বছর বয়স হয়ে গেলে, মানুষের শরীরে যে আলো বাতাসের প্রয়োজন সেটা একমাত্র পাওয়া সম্ভব আলো আর আঁধারের সন্ধিক্ষণে। এই সময় বাতাসের 'ওজন' এবং আলোর 'ইনফ্রা রে' যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করলে এমন একটা অনুপাত মেলে যা মানবদেবের বহু রোগ নিরাময়ের উপযোগী। এরপরেই 'সন্ধিক্ষণ' খোঁজেন জনার্দনবাবু। 'সন্ধিক্ষণ' পাওয়া যায় দুটো হাফে। ফার্স্ট হাফ কাকভোরে। যখন রাত ফুরিয়ে দিন শুরু হচ্ছে। সেকেণ্ড হাফ সন্ধে নাগাদ। ফার্স্ট হাফ নিতে হলে ভোর সাড়ে চারটের মধ্যে সেজেগুজে বেরিয়ে পড়তে হবে। সেটা সম্ভব নয়। তাই সেকেণ্ড হাফ বেছেছেন। জনার্দনবাবু এখন বিকেল সন্ধের মাঝখানে হাঁটেন। এতে নাকি উপকারও পেয়েছেন। ঘুম ভাল হচ্ছে। শকুন্তলাদেবী একথা

মানেন না। তিনি ভুরু কুঁচকে স্বামীকে বলেন, 'তুমি আবার কবে কম ঘুমোলে! বুড়ো হলে মানুষের ঘুম কমে, তোমার তো রিটায়ার করার পর থেকে ঘুম বেড়েছে দেখছি। আগে শুধু রাতে ঘুমোতে, এখন দুপুরেও ঘুমোচ্ছো। কোনও কোনও দিন বেলা পর্যন্ত বিছানায় গড়াচ্ছো।'

জনার্দনবাবু স্ত্রীর অজ্ঞতায় দুঃখ পান। বলেন, 'আহা শকুন্তলা, ঘুম মানে শুধু চোখ বুঁজে ঘুম নয়। আরও বেশি কিছু। ঘুমের ভেতরের বিভিন্ন লেয়ার থাকে। যাকে বলে স্তর। এই স্তরের ওপরই ঘুমের ভাল মন্দ, ঠিক বেঠিক নির্ভর করে। একটা স্তর ভাল তো, অন্যটা দুর্বল। একটা ছটফটে তো অন্যটা ঝিম ধরা। হারমোনিয়ামের রিডের মতো। বাঁধায় গোলমাল হলে সুরেও গোলমাল। ঘুমের সা রে গা মা। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। যে ঘুমোয় সে-ই জানতে পারে। তাও চেতনে পারে না, অবচেতনে পারে। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, আমার সান্ধ্যভ্রমণের পর ঘুমের সবকটা স্তরই চমৎকার। মিলেমিশে থাকে। তুমি যদি চাও আরও ডিটেইলসে ব্যাপারটা বোঝাতে পারি।'

শকুন্তলাদেবী বললেন, 'না চাই না। যতসব হাবিজাবি কথা। তুমি তোমার হারমোনিয়াম ঘুম নিয়ে থাক। কণির ফোন করার সময় হয়ে গেছে। তুমি কি কণিকে কিছু বলবে?'

জনার্দনবাবু হতাশ গলায় বললেন, 'না বলব না'।

কণি, কণিকা। জনার্দনবাবু-শকুন্তলাদেবীর মেয়ে। চমৎকার মেয়ে, ডাক্তার। বস্টনে থাকে, হাসপাতালে চাকরি করে। সেখানেই বিয়ে করেছে। বর আরও চমৎকার। অভিজ্ঞান সেনগুপ্ত। লেখাপড়ার মানুষ। কলেজে পড়ায়। কলেজে ক্লাস না থাকলে লাইব্রেরিতে গিয়ে মোটা মোটা ইতিহাসের বই খুলে বসে থাকে। বাড়ি ফিরতে ভুলে যায়। কণিকা হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে ডেকে নিয়ে যায়। কণি প্রতিদিন দু'বেলা করে তার বাবা-মাকে টেলিফোন করে। একবার হাসপাতাল যাওয়ার আগে, একবার হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে। অভিজ্ঞান সপ্তাহে একবার শ্বশুর শাশুড়ির কুশল সংবাদ নেয়। প্রতি সপ্তাহে একবার করে শ্বশুর শাশুড়ির কুশল সংবাদ নেওয়া সহজ কথা নয়। বস্টন তো দূরের কথা, বর্ধমানে থাকা জামাইরাও একাজ করে না। শকুন্তলাদেবীর মামাতো দিদির জামাই তো একবার গড়িয়াহাটের মোড়ে শাশুড়িকে চিনতেই পারেনি। ফুটপাথের ভিড়ে নিচু গলায় বলেছিল, 'দিদিমা, একটু সাইড দেবেন প্লিজ।' সেই 'শাশুড়ি' টানা তিনদিন খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়। অনেকে বলেছিল, উনি নাকি জামাইয়ের না চেনার থেকে 'দিদিমা' ডাকায় বেশি দুঃখ পেয়েছিলেন। 'দিদিমার' বদলে 'দিদি' বা 'ম্যাডাম' বললে এই দুঃখ হত না। শুধু মেয়ে নয়, জনার্দনবাবুর দুই ছেলে আর তাদের বউয়েরাও খুব ভাল। এমন নয় যে তারা কলকাতায় থাকে, তারাও বাইরে থাকে। বড় ছেলে অতীশ, ছোট ছেলে দীপংকর। অতীশ থাকে জলন্ধর। দীপংকর বহরমপুর। অতীশ ব্যবসা করে। দীপংকর দেড়খানা কাজ করে। ফুলটাইম রাজনীতি, হাফ টাইম নাটক। অতীশের বিরাট রোজগার। তিনতলা বাড়ি। দু-দুটো গাড়ি। দীপংকরের রোজগার সামান্য। দুটো দল থেকেই অল্প মাসোহারা পায়। রাজনৈতিক দল এবং নাটকের দল। দীপংকর আর পাঁচটা রাজনীতির লোকের মতো নয়। সে সৎ। তার স্ত্রী শিল্পকলা জগতের মেয়ে। বাবা প্রেমাংশু শান্তিনিকেতনে কলাভবনের শিক্ষক ছিলেন। সৃজনীর ভারি সুন্দর গানের গলা। সে বহরমপুর স্কুলের বাংলার শিক্ষিকা। নিজের একটা গানের স্কুল আছে। মিষ্টি স্বভাবের জন্য তাকে স্কুলের মেয়েরা আড়ালে 'আঙুর দিদি' বলে ডাকে।

প্রথম ছেলে হওয়ার পর জনার্দনবাবু চেয়েছিলেন তার নাম হোক অতীশ দীপংকর। শকুন্তলাদেবী রাজি হলেন না। তিনি হাসপাতালের বেডে শুয়েই আপত্তি জানালেন।

'এ আবার কেমন নাম?'

'কেমন নাম মানে, মহাজ্ঞানী অতীশ দীপংকরের নাম শোনওনি?'

'তোমার ছেলে যে মহাজ্ঞানী হবে বুঝলে কী করে?'

জনার্দনবাবু উৎসাহ নিয়ে বললেন, 'নাম কী আর আগাম বুঝে হয়? তাছাড়া নামের চাপেও অনেক সময় অনেককিছু হয়েও যায় আমার এক বন্ধুর নাম ছিল...।'

শকুন্তলাদেবী মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'থামো, অত বড় নাম চলবে না।'

বাধ্য হয়ে শুধু অতীশে জনার্দনবাবুকে থামতে হল। তবে ইচ্ছে পূর্ণ হল পরের ছেলেকে দিয়ে। ছোট ছেলের নাম রাখলেন দীপংকর। তিনি যখনই কথা বলেন, 'অতীশ দীপংকর' একসঙ্গে বলতে পছন্দ করেন। তবে শকুন্তলাদেবীর কথা সত্যি হয়েছে। বড় ছেলে মহাজ্ঞানী হয়নি। বরং মহামূর্খই হয়েছে বলা যায়। কোনওরকমে স্কুল শেষ করেছে। হায়ার সেকেন্ডারিতে সেকেন্ড ডিভিশন। তাও নিচের দিকে। কলেজে ভর্তি হয়েও পুরোটা টানতে পারেনি। মাঝখানে পড়াশোনা থামিয়ে ব্যবসা। ইট বালি সাপ্লাই দিয়ে শুরু। এ শহর থেকে সে শহর করে শেষ পর্যন্ত বাংলা ছেড়ে পাড়ি দেয় বাইরে। এখন জলন্ধরে। পরিশ্রম করে নিজে নাটবল্টুর কারখানা দিয়েছে। কারখানার নাম 'টাইট'। কয়েক বছরে 'টাইট' হইচই কান্ড করে ফেলল। ব্যবসা বিরাট। সরকারি অর্ডারে হাবুডুবু অবস্থা। লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভা হলেও অতীশ ছেলে অতি ভাল। তার পাঞ্জাবি বউ নীতিকাও ভাল। কতবার যে সে শ্বশুরশাশুড়িকে জলন্ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছে তার শেষ নেই। অতীশ বলেছে, 'বাবা, তুমি তো রিটায়ার করেছো, এবার আমার বিজনেসে এসে বসো। আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত হই।'

জনার্দনবাবু সিঁটিয়ে যান। বলেন, 'না, বাপু এই বুড়ো বয়সে আর নতুন করে ব্যবসা শিখতে পারব না।'

'তোমার কোনও চিন্তা নেই। আমি সব শিখিয়ে দেব। তোমার তো আমার মতো কাউডাংক মাথা নয় বাবা, তোমার মাথা হল কাউমিল্ক মাথা। তিনদিনে সব জেনে যাবে।'

জনার্দনবাবু গাঢ় গলায় বলেন, 'বাজে কথা বলিস না। গাদা খানেক কলেজ ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি থাকলেই মাথা ভাল হয় না। যার যেদিকে ন্যাক সেখানে কিছু করতে পারল কি না সেটাই আসল। তোর ন্যাক ব্যবসায়। তুই তাতেই করেছিস্। তোর ন্যাক যদি লেখাপড়ায় হত তাহলে হয়তো তুই চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হতিস। আজ তুই একজন শিল্পপতি। কার থেকে কম?'

'কী যে বল বাবা! তোমার আবার বেশি বেশি। শিল্পপতি কীসের? বানাই তো নাটবল্টু।'

জনার্দনবাবু স্নেহের হাসি হাসেন। বলেন, 'নাটবল্টু কি আর যা-তা জিনিস রে বাপু? নাটবল্টু ছাড়া কোন জিনিসটা চলে? মানুষেরও নাট বল্টু লাগে। ব্রেইনে যদি নাটবল্টু ঢিলে হয়ে যায় তাহলে কী অবস্থা হয়? হা হা।'

নীতিকাও শকুন্তলাদেবীকে পাঞ্জাবে ডাকে। ভাঙা বাংলায় বলে, 'বাড়ি টাড়ি বেঁচে চোলে আসুন মাইজি। এখানে ভাংড়া শিখবেন।'

শকুন্তলাদেবী হাসতে হাসতে বলেন, 'এই বুড়ো বয়সে আর ভাংড়া শিখে কাজ নেই।'

অতীশ বাবা-মায়ের জন্য গাড়ি কিনে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছে। জনার্দনবাবু খুশি হয়েছেন, শকুন্তলাদেবী রাজি হননি।

'এই বয়সে গাড়ি দিয়ে কী হবে? আমরা যাই কোথায়?'

অতীশ বলল, 'কোথাও যেতে হবে না মা। গ্যারেজে রেখে দেবে। মাঝে মধ্যে গঙ্গার ধারে বাবাকে নিয়ে যাবে।'

'খেপেছিস? বাড়িতেই তোর বাবাকে সহ্য হয় না, তার ওপর আবার গঙ্গার ধার!'

'গঙ্গার ধারে সহ্য হবে মা। তুমি একবার ট্রাই করে দেখ। আমি একটা সুইফট বুক করে দিচ্ছি।'

'লক্ষ্মী সোনা আমার, সুইফট, লেট কিছু বুক করতে হবে না।'

দীপংকরের দাদার মতো বাবা-মাকে গাড়ি কিনে দেওয়ার ক্ষমতা নেই, কিন্তু সুযোগ পেলেই বহরমপুর থেকে ছানাবড়া পাঠায়। সৃজনীর শান্তিনিকেতন ব্যাকগ্রাউণ্ড থাকার কারণে ফোনের বদলে হাতে লিখে শ্বশুরশাশুড়িকে চিঠি পাঠায়। সুন্দর চিঠি। মাথায় নিজের হাতে একটুখানি কলকা এঁকে দেয়। শকুন্তলাদেবী শিল্পী পুত্রবধূর এইসব চিঠি অতি যত্নে রেখে দেয়। প্রতিবেশীকে গর্ব করে দেখায়। তার লেখা শেষ চিঠিটা এরকম—

মা কেমন আছো? বাবার সঙ্গে রোজ ঝগড়া হচ্ছে? হলে বুঝবে সব ঠিক আছে। নইলে সমস্যা। দীপংকর খুব ঝামেলায় পড়েছে। ওকে কাউন্সিলর ইলেকশনে দাঁড়াতে বলছে। ও তো কিছুতেই রাজি নয়। বলছে, জিতলেই সর্বনাশ। খারাপ হয়ে যেতে হবে। এদিকে দলের কথা শুনতেই হবে। আমি বলেছি, এক কাজ কর, তুমি ইলেকশনে দাঁড়িয়ে ইচ্ছে করে হারো। দলের কথা শোনা হল, আবার খারাপও হতে হল না। আইডিয়া কেমন? বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে জানাবে। টুংরি খুব ঠাকুমা ঠাকুমা করছে। স্কুল খোলা না থাকলে সল্টলেকে নিয়ে যেতাম। চার বছরের মেয়ে কিছু বুঝতে চায় না। তোমরা এসো না। দুদিন থেকে যাও। নাকি তোমার আর বাবারও স্কুল খোলা? দুজনেই ভাল থাকবে। রোজ ঝগড়া করবে। নিয়ম করে প্রেশার, সুগার মাপাবে। আমার, দীপংকরের প্রণাম নেবে, তবে আমাকে বেশি আশীর্বাদ করবে। পরের বাড়ির মেয়ে বলে কথা।

পুঃ একটা গোপন খবর দিতে ভুলে গেছি। বস্টন থেকে দিদি এবং জলন্ধর বসে বড়দা একটা ভয়ংকর প্ল্যান করছে। কাউকে বলতে চাইছে না। সামনের গ্রীষ্মে ওরা আমাদের সবাইকে আমেরিকা নিয়ে যেতে চায়। ওরাই ভাগাভাগি করে প্লেনের টিকিট কাটবে। কয়েক লক্ষ টাকার ব্যাপার। আমি বলেছি, তোমরা শুধু বাবা-মাকে নিয়ে যাও। আমাদের তিনজন বাদ। দিদি শুনছে না। মা, যে করেই হোক তোমাকে এটা আটকাতে হবে। দীপংকর কিছুতেই এত টাকা খরচ করতে দেবে না। ওকে তো তুমি চেনো। তবে একটা ভাল খবর, খুব শিগগিরই, অভিজ্ঞানদা কলেজের হিস্টরিকাল ট্যুর নিয়ে আমেরিকা থেকে উড়ে আসছে। দীপংকর ওকে গোটা মুর্শিদাবাদ ঘুরিয়ে দেখাবে। টুংরি পিসেমশাইকে দেখবে বলে এখন থেকেই লাফাচ্ছে। তার ধারণা, যারা ইতিহাস নিয়ে লেখাপড়া করে তারা বাবর, আকবরের শেরশাহের আত্মীয় হয়। তখন তোমাদের সবাইকে আসতে হবে। দাদাদেরও। বিনিপয়সার গাইড কিছুতেই ছাড়া যাবে না।

পুঃ২ মা, এই শ্রাবণ-বেলা বাদল ঝরা যুথীবনের গন্ধে ভরা গানটার স্বরলিপি কি তোমার জানা আছে? আমি কোথাও পাচ্ছি না।

ইতি সৃজনী।

চোখের জল দু'প্রকার। সুখের এবং দুঃখের। পুত্রবধূর চিঠি পড়ে শকুন্তলাদেবীর চোখে যে জল এলো সেটা সুখের। তিনি গানের খুব বেশি কিছু জানেন না। সেই কোন কলেজে পড়ার সময় শিখেছিলেন। এখন ভুলেই গেছেন। চর্চাও বন্ধ অনেককাল। অথচ সৃজনী স্বরলিপি জানতে চেয়ে কীভাবেই না তাকে সম্মান দিল! সম্মান না ভালবাসা? শকুন্তলাদেবী চোখের জল লুকিয়ে ড্রইংরুমে গেলেন। জনার্দনবাবু পাশে বসে। চিঠিটা এগিয়ে বললেন, 'নাও'।

'কী এটা?'

'দেখতে পাচ্ছ না?'

'চিঠি মনে হচ্ছে।'

'মনে হওয়ার কী আছে। দেখাই তো যাচ্ছে।' বিরক্ত হলেন শকুন্তলাদেবী।

'কার চিঠি?'

'খুলেই দেখ না।'

মানুষের বোধহয় এটাই স্বভাব, চিঠি পাওয়ার জন্য সবসময় ব্যস্ত হয়ে থাকে। কিন্তু চিঠি হাতে পেয়ে গেলে সহজে পড়তে চায় না। চিঠি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন জনার্দনবাবু। তারপর পড়লেন। একবার পড়লেন, দু'বার পড়লেন। আশ্চর্যের কথা, স্ত্রীর মতো তার চোখেও জল এলো। সুখের জল। তিনিও চোখের জল লুকোলেন। গলা খাঁকাড়ি দিয়ে নিজেকে সামলে বললেন, 'মেয়েটার হাতের লেখা বড় সুন্দর। তাই না?' যেন এটাই আসল, চিঠির কথাগুলো নয়।

এর কিছুদিন পরেই এক শনিবার ঘটনা ঘটল।

সান্ধ্যভ্রমণ সেরে বাড়ি ফিরলেন জনার্দনবাবু। জনার্দনবাবু সাধারণত ছ'টা কুড়ি বাইশের মধ্যে বাড়ি ফিরে আসেন। গরমকালে একটু দেরি হয়। সেদিন ফিরলেন ছ'টা পনেরো মিনিটে। নিজের ঘরে এসে হাত মুখ ধুয়ে পোশাক বদলালেন। তারপর খাটে বসে শকুন্তলাদেবীকে ডাকলেন।

'কী হয়েছে? চা খাবে তো?'

'না, কিছু খাব না। তুমি সবাইকে খবর দাও।'

চমকে উঠলেন শকুন্তলাদেবী। মানুষটা বলে কী! সবাইকে খবর দিতে চায় কেন। তিনি কয়েক পা এগিয়ে আসেন খাটের দিকে। জনার্দনবাবু বসে আছেন পা ঝুলিয়ে। পায়জামা পরা পা দুটো একটু একটু নড়ছেও। গলায় উদ্বেগ এনে শকুন্তলাদেবী বললেন, 'সবাইকে খবর দেব! খবর দেব মানে!'

জনার্দনবাবু স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'মনে হচ্ছে মারা যাব। তুমি ছেলেমেয়েদের খবর দাও।'

শকুন্তলাদেবীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি স্বামীর বুকে হাত রাখলেন। বললেন, 'সে কী গো! এসব কী অলুক্ষণে কথা বলছো? মারা যাবে কেন? বুকে ব্যথা করছে?'

'না।' সহজভাবে বললেন জনার্দনবাবু।

'তাহলে? পেটে, মাথায়?'

'না, কোথাও কিছু হচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে মারা যাব।'

শকুন্তলাদেবীর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসার জোগাড়। তিনি স্বামীর কপালে, গলায় হাত দিলেন। না, জ্বর টর তো কিছু নেই। ধরে শুইয়ে দিতে চাইলেন। জনার্দনবাবু অবাক গলায় বললেন, 'শোয়াতে চাইছো কেন? আমার শরীর খারাপ হয়নি!'

'না হলে না হয়েছে, তুমি আগে শোও।' এবার কাঁধ ধরে চাপ দিলেন শকুন্তলাদেবী।

জনার্দনবাবু বললেন, 'মারা যাব বলে এখনই শুতে হবে নাকি? আগে থেকে কাজ এগিয়ে রাখতে চাইছো?'

'চুপ, একদম বাজে কথা বলবে না। আমি ডাক্তার সেনকে ডাকছি।'

জনার্দনবাবু এবার পা দুটো খাটের ওপর তুলে বাবু হয়ে বসলেন। এটা তার সবথেকে পছন্দের বসার ভঙ্গি। বললেন, 'ডাকতে পারো। কিছু লাভ হবে না। যা ঘটবার তা তো ঘটবেই। তুমি ছেলেমেয়েদের আসতে বল। কণি কত তাড়াতাড়ি আসতে

পারবে? ওকে নিয়েই সমস্যা হবে। প্লেনের টিকিট পাবে? মনে হয় পেয়ে যাবে। ওখানে নানারকম ব্যবস্থা আছে। দেশে বাবা মরছে শুনলে ওরা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে একটা কিছু করে দেবে। নিজেরা নিজেদের বাপ-মা, ভাই বোনকে তো চেনে না, তাই অন্যদের জন্য করে। অতীশকে বল আজ রাতেই রওনা দিতে। জলন্ধর থেকে প্লেনের টিকিট পেতে অসুবিধে হবে না। তাছাড়া ওর টাকা পয়সা আছে। আমাদের দেশে টাকা পয়সা থাকলে সব হয়। নীতিকা যেন আসে। দীপংকর এখনই গাড়ি টাড়ি ভাড়া করে নিক।' কথা থামিয়ে হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলেন জনার্দনবাবু। বললেন, 'বারোটা-একটার মধ্যে পৌঁছে যাবে। সৃজনী, টুংরিকে নিয়ে এত রাতে রওনা হতে বলতাম না, কিন্তু হাতে সময় বেশি আছে বলে মনে হচ্ছে না শকুন্তলা।'

শকুন্তলাদেবী এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে, বললেন 'তুমি থামবে? থামবে তুমি?' জনার্দনবাবু স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন, 'এই দেখো, তুমি কান্নাকাটি শুরু করলে কেন? কান্নার তো অনেক সময় পাবে। তুমি দেখছি, সত্যি সব কাজ আগে গুছিয়ে রাখতে চাইছো।'

স্বামীর হাসি দেখে স্বস্তি পেলেন শকুন্তলাদেবী। যে মানুষ এক্ষুনি 'মারা যাবে' সে কখনও পা নাড়িয়ে নাড়িয়ে হাসতে পারে?

'চুপ করো।'

'ঠিক আছে, চুপ করছি। তুমি গিয়ে ছেলেমেয়েদের টেলিফোন করো। না পারলে তোমার মোবাইলটা আমাকে দাও। আমিই বলছি, তোরা এবার বাড়ি আয়, তোদের বাবা মরছে।'

কথা শেষ করে আওয়াজ করে হেসে উঠলেন জনার্দনবাবু।

'আর এক মিনিটও এ ঘরে থাকব না। যত সব ঠাট্টা তামাশা!'

রাগ দেখিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন শকুন্তলাদেবী। ঠিকই করলেন, রসিকতারও একটা সীমা থাকে। জনার্দনবাবুর উদ্ভট কথা শুনে কিছুক্ষণের জন্য তিনি নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলেন, তার মানে এই নয় দীর্ঘ সময় নার্ভাস হয়ে থাকবেন। তিনি শক্ত মনের মানুষ। এতদিন সংসার করছেন। ছেলেমেয়ে কেউ হাতের কাছে থাকে না। সবই তো একা একা সামলান। তিনি ছেলেমেয়েকে ফোন না করে ডাক্তার সেনকে কল দিলেন। বহুদিনের পরিচিত।

'কী হল আবার?'

শকুন্তলাদেবী বললেন, 'বুঝতে পারছি না, আপনি একবার আসুন। বলছে মরে যাব।'

'বলেন কী! এক্ষুনি যাচ্ছি।'

ডাক্তার এসে সব দেখেশুনে বললেন, 'এভরিথিং ওকে। প্রেশার, পালস, জিব, গলা সব ঠিক আছে। তবু আপনি আমার গাড়িতে উঠুন। ইসিজি করাব।'

গাঁইগুই করেও জনার্দনবাবু গেলেন। ইসিজি রিপোর্ট স্বাভাবিক এলও। একটু স্বাভাবিক নয়, বেশি স্বাভাবিক। রক্তের ফোঁটা নিয়ে মেশিনে সুগার মাপা হল। কোনও গোলযোগ নেই। ডাক্তার সেন একটা হালকা ঘুমের ওষুধ দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'আর যদি মরে যাব মরে যাব বলে আমাকে কল দেন, তাহলে কিন্তু আমিই মরে যাব।'

জনার্দনবাবু বাড়ি ফিরে বললেন, 'তুমি অকারণ দেরি করছো শকুন্তলা। ছেলেমেয়েদের খবর দাও।'

শকুন্তলাদেবী তাড়াতাড়ি স্বামীকে ঘুমের ওষুধ আর রাতের খাবার খাইয়ে দিলেন। তারপর জনার্দনবাবু ঘুমিয়ে পড়ার পর এক এক করে ছেলেমেয়েদের ফোন করতে বসলেন। জমিয়ে বসলেন। গায়ে একটা হালকা চাদর দিলেন। চাদর দেওয়ার মতো

সময় হয়নি, তবু কেন জানি শকুন্তলাদেবী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় গায়ে চাদর দিতে ভালবাসেন। মনে হয় বাড়িতে বসে মুখোমুখি কথা বলছেন।

প্রথমে কণিকা। কণিকা বলল, 'মা, তুমি চিন্তা করো না।'

'আমি চিন্তা করছি না।'

'বাবার বয়স হয়েছে। বয়স হলে মানুষের মনে এরকম একটা ডেথ ফিয়ার আসে।'

'আমারও তো বয়স হয়েছে। কই আমার মনে তো আসছে না!'

'আহা, সবার কেন আসবে। কারও কারও আসে। তুমি এক কাজ করো, বাবাকে একটা সিটি স্ক্যান করাও। তারপর সব রিপোর্ট আমাকে মেল করে দাও। ঠিক আছে, তোমাকে কিছু করতে হবে না। আমি সেনকাকুর সঙ্গে নিজে কথা বলব।'

শকুন্তলাদেবী একটু সময় চুপ করে থেকে বললেন, 'তুই একবার জামাইকে নিয়ে আসবি নাকি?'

সুদূর বস্টন থেকে কণিকার বিস্ময় গলা ভেসে এল সল্টলেকে।

'কী বলছো মা! আমরা কেন যাব! বাবার তো কিছুই হয়নি! নার্ভ রিল্যাক্সের ওষুধ খেলে কাল পরশুর মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'তাও...।'

শকুন্তলাদেবীর এই বেয়ারা আবদারে চমৎকার মেয়ে কণিকা 'তাও কী মা? আমি হাসপাতাল থেকে অকারণে ছুটি নেব? বাবার যদি কিছু হত তাহলে না হয় একটা কথা ছিল মা। আর অভিজ্ঞানের কী অবস্থা তুমি জানো না। সাতদিন হল সাইলেন্স অফ সাইলেন্ট এরা! নিয়ে স্নান খাওয়া ভুলে ডুব মেরেছে।'

'সাইলেন্স অফ্ সাইলেন্ট এরা! সেটা কী?'

কণিকা হেসে বলল, 'ইতিহাসের বই। মেসপটেমিয়া যুগের রাজনীতি।'

শকুন্তলাদেবী বুঝলেন, আমেরিকা থেকে ওদের আসতে বলাটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। বরং অতীশদের আসাটা অনেক সহজ হবে। জলন্ধর থেকে ঘন ঘন প্লেন। অতীশ সব শুনে চিন্তিত গলায় বলল, 'কণি কী বলল?'

'কণি বলল কিস্যু হয়নি। বয়স হলে এরকম মাঝে মাঝে নাকি হয়। তবু তুই যদি একবার আসিস। বুড়ো মানুষটা দেখতে চাইছে...।'

'ইমপসিবল। এখন কলকাতা যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না মা। সিরিয়াস কিছু হলে আমি যেতাম। এই মুহূর্তে প্রায় এক কোটি টাকার অর্ডার নিয়ে হিমশিম খাচ্ছি। জাহাজের জন্য নাট বল্টু সাপ্লাই। আমি পোর্টব্লেয়ারে যাচ্ছি কালই। তুমি যদি বলো নীতিকাকে পাঠাতে পারি। আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয়, বাবাকে কাল পরশুর মধ্যে যদি এখানে ফ্লাই করিয়ে আনি। আমার ফার্ম হাউসে কটা দিন থাকবে। পিওর ঘি দেওয়া চাপাটি আর নিজের ক্ষেতের ডাল খাবে। ফালতু চিন্তা মাথা থেকে পালাবে। আসবে?'

শকুন্তলাদেবী বললেন, 'থাক্। ও রাজি হবে না। তুই বরং কাল বাবার সঙ্গে কথা বলে নিস।'

দীপংকরের মোবাইল বন্ধ। বাড়িতে সৃজনী ফোন ধরল। সে টুংরিকে ঘুম পাড়াচ্ছিল। ঘটনা শুনে খিলখিল করে হাসতে শুরু করল। শকুন্তলাদেবী বিরক্ত গলায় বললেন, হাসছিস কেন?' শকুন্তলাদেবী তার এই পুত্রবধূকে নিজের মেয়ের মতোই 'তুই' সম্বোধন করেন।

'হাসব না। তুমি বাবার প্ল্যানটা বুঝতে পারলে না মা? হি হি।'

'প্ল্যান! কী প্ল্যান?'

'বাবা আসলে আমাদের সবাইকে দেখতে চান। তাই মরে যাচ্ছি বলে ঘাবড়ে দিচ্ছেন। যাতে আমরা সবাই ছুটে কলকাতায় চলে যাই। হি হি। তুমি ডাক্তার টাক্তার ডেকে... হি হি।'

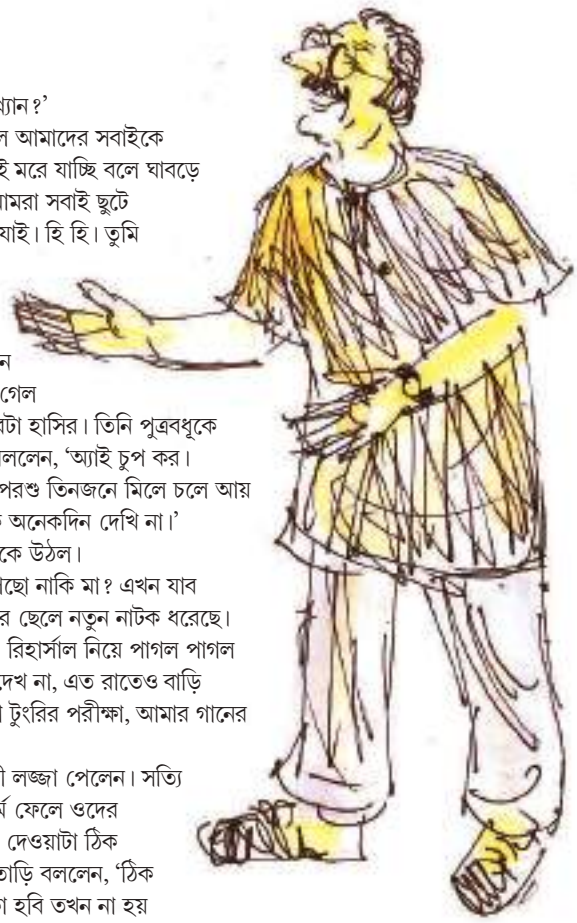

হাসি শুনে শকুন্তলাদেবীর মন খুব হালকা হয়ে গেল সত্যি তো ব্যাপারটা হাসির। তিনি পুত্রবধূকে ছদ্ম ধমক দিয়ে বললেন, 'অ্যাই চুপ কর। হাসবি না। কাল পরশু তিনজনে মিলে চলে আয় তো। নাতনিটাকে অনেকদিন দেখি না।'

সৃজনী আঁতকে উঠল।

'যাব? খেপেছো নাকি মা? এখন যাব কী করে? তোমার ছেলে নতুন নাটক ধরেছে। মানিকবাবুর গল্প। রিহার্সাল নিয়ে পাগল পাগল হয়ে আছে। এইদেখ না, এত রাতেও বাড়ি ফেরেনি। তাছাড়া টুংরির পরীক্ষা, আমার গানের ক্লাস আছে না?'

শকুন্তলাদেবী লজ্জা পেলেন। সত্যি তো এত কাজকর্ম ফেলে ওদের আসার জন্য চাপ দেওয়াটা ঠিক নয়। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'ঠিক আছে, যখন ফাঁকা হবি তখন না হয় এক-দু' দিনের জন্য ঘুরে যাস।'

সৃজনী ঝিনঝিনে মিষ্টি গলায় বলল, 'নিশ্চয় যাব। তবে বাবাকে আগে বলতে হবে, আমি বেঁচে থাকব, আমি বেঁচে থাকব, আমি বেঁচে থাকব। তারপর যাব। হি হি।'

এবার শকুন্তলাদেবীও হেসে ফেললেন। ফোন রেখে দেওয়ার আগে সৃজনী বলল, 'মা, এই শ্রাবণ-বেলা বাদল ঝরা যুথী বনের গন্ধে ভরা' গানটার কোনও খবর পেলে?'

ঠিক এক সপ্তাহ পর, এক শনিবার...।

ইভনিংওয়াক সেরে বাড়ি ফিরলেন জনার্দনবাবু। ফিরে চমকে উঠলেন। চমকে ওঠবারই কথা। একমুখ হাসি নিয়ে দরজা খুলল কণিকা! পিসির পিছন থেকে কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল চার বছরের টুংরি। নিজেকে ধাতস্ত করতে না করতে রান্নাঘর থেকে গন্ধ পেলেন ঘিয়ের। সেখানে পাঞ্জাবি রেসিপিতে হালুয়া বানাচ্ছে নীতিকা। তাই এত ঘিয়ের গন্ধ। জনার্দনবাবু ক্যাবলা ক্যাবলা মুখে বাড়ির ভিতর ঢুকলেন। ড্রইংরুমে মমতা ব্যানার্জি-বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে নিয়ে তুমুল ঝগড়া করছে দুই ভাই। আলাদা আলাদা করলে অতীশ আর দীপংকর। একসঙ্গে অতীশ দীপংকর। জনার্দনবাবু যে বাড়ি ফিরেছেন সে খেয়ালও তাদের নেই! না থাকুক। বহু বছর পর দুই ছেলের ঝগড়া শুনছেন জনার্দনবাবু। মনে মনে বললেন, আহা! ঝগড়া চলুক। সারারাত ধরে চলুক। অধ্যাপক অভিজ্ঞান সেনগুপ্ত এত ঝগড়ার মধ্যেও 'সাইলেন্স অফ সাইলেন্ট এরা' বইটা নিয়ে এককোনায় ঘাপটি দিয়ে বসে আছে। সৃজনী, ট্রে তে সাজানো চায়ের কাপ নিয়ে ঘর ঢুকল। শ্বশুরমশাইকে দেখে চোখ কপালে তুলে বলল, 'সেকি! বাবা, আপনি এখনও বেঁচে আছেন?'

জনার্দনবাবুর সবটাই স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। তিনি লুকিয়ে নিজের পায়ে চিমটি কাটলেন।

ইলিশের পঞ্চব্যঞ্জন

বর্ষা মানেই বৃষ্টি, সবুজ গাছ, রোদের চিকচিকে আভা, আর ইলিশ মাছ। বাঙালির প্রিয় এই মাছ নিয়ে কাব্য করলেও সেটা যথেষ্ট নয়। ইন্দ্রাণী গুহ অবশ্য কাব্য করেননি, শুধু এমন পাঁচটি ইলিশ পদের হদিশ দিয়েছেন যা রসনার বাসনা তৃপ্ত করে।

সর্ষে ইলিশ

কী কী লাগবে

ইলিশ মাছ : ৬ টুকরো (৪০০/৪৫০ গ্রামের মধ্যে ; সর্ষে বাটা : ৩ চা-চামচ (সঙ্গে ৪/৫ টা কাঁচা লঙ্কাও বেটে নিতে হবে) ; কাঁচালঙ্কা : ৮/৯টা ; নারকোল বাটা : ২ চা চামচ ; হলুদ গুঁড়ো : $^{৩}/_{৪}$ চা চামচ ; সর্ষের তেল : ৩ টেবিল চামচ ; নুন : আন্দাজ মতো।

কী করে করবেন

মাছের টুকরোয় আন্দাজ মতো নুন ও $^{১}/_{৪}$ চা-চামচ হলুদ মাখিয়ে রাখুন। ছোট একটা বাটিতে আধ চামচ হলুদগুঁড়ো ও পরিমাণ মতো নুন এবং অল্প জল দিয়ে একটা মিশ্রণ বানিয়ে রাখুন। কড়াইতে ১ টেবিল চামচ তেল দিন। তেল গরম হলে, তাতে হলুদ নুনের মিশ্রণটা ঢেলে, তার উপর মাছগুলো সাজিয়ে, এ-পিঠ ও-পিঠ করবেন। তারপর সামান্য জল দিয়ে, তাতে সর্ষেবাটা, নারকোল বাটা ও আন্দাজ মতো নুন দিয়ে ঢেকে দিন। জল মরে এলে, তাতে ৪টে আস্ত কাঁচা লঙ্কা ও বাদ-বাকি ২টেবিল চামচ তেল ঢেলে দিন। এক মিনিট ফুটিয়ে, গ্যাস বন্ধ করে দিন। সর্ষে ইলিশ তৈরি। শুধু পাতে দেওয়ার অপেক্ষা।

ইলিশ পাতুড়ি

কী কী লাগবে

ইলিশ মাছ : ৬ টুকরো (৪০০/৪৫০ গ্রাম) মধ্যে ; ৫ টা কাঁচালঙ্কা সহ সর্ষে বাটা : ৫ চামচ ; নারকোল কোরা বাটা : ৩ চামচ ; তেল (সর্ষের) : ৩ টেবিল চামচ ; হলুদ গুঁড়ো : $^{৩}/_{৪}$চা-চামচ ; আস্ত কাঁচালঙ্কা ৬টা ; নুন : আন্দাজ মতো ; কলাপাতা : ৬ টুকরো ; সুতো : কিছুটা।

কী করে করবেন

প্রথমে মাছের টুকরোগুলো হলুদ ও নুন মাখিয়ে রাখুন। তাতে সর্ষে বাটা, নারকোল-কোরা বাটা, হলুদ গুঁড়ো, নুন ও তেল দিয়ে মেখে রাখুন। কলাপাতার টুকরোগুলো ভাল করে ধুয়ে তাওয়ায় এ-পিঠ ও পিঠ করে নিন। তাতে পাতা নরম হবে। প্রত্যেক টুকরো কলাপাতায় এক টুকরো করে মাছ, একটা করে কাঁচালঙ্কা ও সমপরিমাণে সর্ষে-নারকোলের মিশ্রণটা দিন। তারপর কলাপাতা মুড়িয়ে সুতো দিয়ে বাঁধুন। এরপর একটা বড় টিফিন কৌটোতে কলাপাতায় মোড়া মাছগুলো, একটা-একটা করে সাজিয়ে নিন। কড়াতে জল দিয়ে তা ফুটতে দিন এবং ফুটন্ত জলে টিফিন বক্সটা দিয়ে উপরে ভারী কিছু চাপা দিন। মিনিট দশেক পর টিফিনবক্স কড়া থেকে নামিয়ে ফেলুন। কলাপাতা সহ-ই পাতে মাছ পরিবেশন করবেন। তবে যিনি খাবেন, তিনি কলাপাতাটা খুলে ভেতরের মশলা সহ মাছটা খাবেন।

যদি কলাপাতার বদলে লাউ পাতায় মোড়া হয়, তবে পাতাটা আর ফেলে দিতে হয় না। ওটাও খাওয়া চলে।

দই-ইলিশ

কী কী লাগবে

ইলিশ মাছ : ৬ টুকরো (৪০০ গ্রাম) ; ঘরে পাতা টক দই : ১৫০ গ্রামের মতো ; সর্ষে ও ৪টে কাঁচা লঙ্কা বাটা : ৫ চা- চামচ ; হলুদ গুঁড়ো : ১/২ চা-চামচ ; নুন : পরিমাণ মতো ; সর্ষের তেল : ৪ টেবিল চামচ ; কাঁচা লঙ্কা : ৬টা।

কী করে করবেন

মাছের টুকরোগুলো প্রথমে হলুদ ও নুন মাখিয়ে রাখবেন। একটা বাটিতে দইটা ভাল করে ফেটিয়ে রাখুন কড়াতে তেল দিয়ে গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। ফেটানো দই, হলুদ গুঁড়ো, সর্ষে বাটা, সব ওই তেলে ছেড়ে দিন। তার উপর মাছগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে দিন। তাতে পরিমাণ মতো নুন দিয়ে, মাছগুলো উল্টে দিন। এরপর মাছটা ঢেকে, আঁচটা কমিয়ে দিন। পাঁচ মিনিট পর ঢাকনা খুলে আস্ত কাঁচালঙ্কা-গুলো দিন। এক মিনিট পরে, কড়া নামিয়ে ফেলুন। দই-ইলিশ রেডি। চেহারা দেখলেই জিভে জল আসবে।

ইলিশ মাছের কষা

কী কী লাগবে

ইলিশ মাছ : ৬ টুকরো (৪০০ গ্রাম) ; পেঁয়াজ বাটা : ৪ চা-চামচ ; রসুন থেঁতো : ২ কোয়া ; হলুদ গুঁড়ো ১/২চা-চামচ ; লঙ্কা গুঁড়ো : ১/২চা-চামচ ; নুন : আন্দাজ মতো ; কাঁচা লঙ্কা : ৫/৬টা ; সর্ষের তেল : ৩ টেবিল চামচ।

কী করে করবেন

মাছগুলো প্রথমে হলুদ নুন মাখিয়ে গরম তেলে এ-পিঠ ও-পিঠ করে ভেজে তুলে নিন। তেলের উপর পেঁয়াজবাটা, রসুন-থেঁতো, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো ও নুন দিন। মশলা ভাজা হলে সামান্য জল দিয়ে, তাতে মাছগুলো ছেড়ে দিন। আস্ত কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মাছগুলো ঢেকে দিন। পাঁচ মিনিট পর, কড়াই নামিয়ে ফেলুন। ঝোলটা বেশ গা-মাখামাখা হবে। দেখলেই খেতে ইচ্ছে করবে।

ইলিশ মাছের তেল-ঝোল

কী কী লাগবে

ইলিশ মাছ : ৬ পিস (৪০০ গ্রাম) ; হলুদ গুঁড়ো : ৩/৪ চা-চামচ ; লংকা গুড়ো : ৩/৪ চা-চামচ ; টম্যাটো : ১ টি (ছোট) ; কালজিরা : ১/৪ চা চামচ; নুন : পরিমাণ মতো ; কাঁচা লঙ্কা : ৪ টে ; সরষের তেল : ৩ টেবিল চামচ।

কী করে করবেন

মাছগুলোতে ১/৪ চা-চামচ হলুদ গুঁড়ো ও আন্দাজ মতো নুন মাখিয়ে রাখবেন। কড়াতে সবটা তেল ঢেলে দেবেন। তেল গরম হলে তাতে কালো জিরে ফোড়ন দিতে হবে। একটা ছোট বাটিতে বাদবাকি হলুদ গুঁড়ো, পুরো লঙ্কার গুঁড়ো ও নুন অল্প জলে গুলে নিয়ে, ফোড়ন দেওয়ার পর কড়াতে ঢেলে দিন। সঙ্গে টম্যাটোটাও ছোট ছোট টুকরো করে কেটে দেবেন। তার উপর হলুদ-নুন মাখানো মাছগুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিন। এক মিনিট পরেই মাছগুলো সব উল্টে দিয়ে এক কাপ জল দিন। তাতে আস্ত কাঁচা লঙ্কাগুলো দিয়ে একটুক্ষণ ঢেকে রাখুন। মিনিট তিনেক পর ঢাকনা খুলে, যখন দেখবেন জল শুকিয়ে শুধু তেল ভেসে রয়েছে, তখন বুঝবেন ইলিশ মাছের তেল-ঝোল রেডি। গরম গরম ভাতের সঙ্গে এই তেল-ঝোল খুবই উপাদেয়। কাউকে খাইয়ে প্রশংসাই পাবেন।

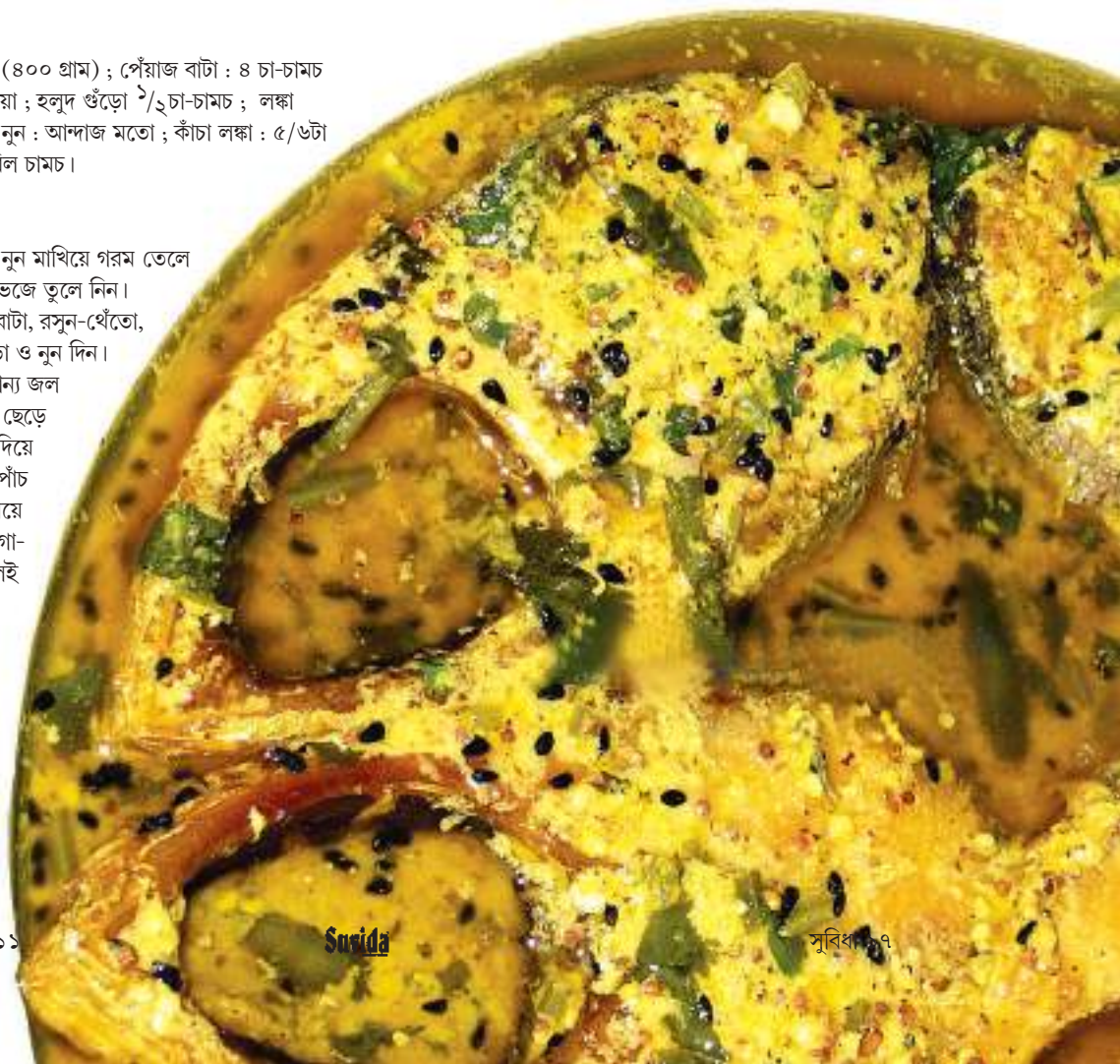

টিকাকরণ

শিশুদের সুরক্ষিত রাখতে প্রতিষেধক টিকা দিতেই হবে। এর অন্য কোনও বিকল্প ব্যবস্থা নেই। যদিও এই টিকাকরণ নিয়ে এখনও বহু মায়ের মধ্যে অজস্র প্রশ্ন চিহ্ন উঁকি দেয়। যেমন, ওইটুকু শরীর অত টিকার ঝক্কি নিতে পারবে কিনা, অপশনাল টিকাগুলো না নিলে কোনও ক্ষতি আছে কি? কিংবা একসঙ্গে একাধিক টিকা দেওয়া হলে সেগুলো ঠিকঠাক কাজ করবে তো? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সংযুক্তা দে।

কেন দেব প্রতিষেধক টিকা

শিশুদের বিভিন্ন অসুখ-বিসুখের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই টিকা দেওয়া দরকার। শিশুর শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে। এই সুযোগে চারপাশে ঘুরে বেড়ানো অসংখ্য জীবাণুদের যে কোনওটা যে কোনও সময় ওদের আক্রমণ করতে পারে। এই জীবাণুদের মধ্যে আবার বেশ কিছু আছে যা শিশুদের প্রাণহানির কারণও হতে পারে। এই সমস্ত মারাত্মক জীবাণুদের থেকে রক্ষা করার জন্যই প্রতিটি শিশুকে দেওয়া দরকার প্রতিষেধক টিকা।

বিশেষ রোগ ছাড়াও কিছু প্রতিষেধক টিকা আছে যা শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এই ধরনের প্রতিষেধক টিকা কে ইংরেজিতে বলা হয় ইমিউনো মডিউলেটর। অর্থাৎ যা ইমিউন সিস্টেমকে উন্নত করতে সাহায্য করে যেমন, চিকেন পক্স-এর ভ্যাকসিন। চিকেন পক্স প্রতিরোধ করার পাশাপাশি অন্যান্য কিছু ভাইরাস যাতে শরীরে প্রবেশ করতে না পারে সেই ব্যবস্থাও করে।

কত রকম টিকা আছে

সাধারণত দু'ধরনের প্রতিষেধক টিকা আছে: লাইভ বা জীবন্ত এবং ডেড কমপোনেন্ট ভ্যাকসিন। লাইভ ভ্যাকসিনগুলোতে জীবন্ত অবস্থায় খুব কম পরিমাণে কিছু ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া শরীরে প্রবেশ করানো হয়। যেমন, ওরাল পোলিও হল লাইভ ভ্যাকসিন। কিন্তু কমপোনেন্ট ভ্যাকসিন-এ জীবাণু জীবন্ত অবস্থায় থাকে না। শরীরে প্রবেশ করার পর এই ভ্যাকসিন সেল বা কোষের সঙ্গে মিশে গিয়ে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। যেমন, হেপাটাইটিস-এর ভ্যাকসিন।

এসেনশিয়াল না অপশনাল

শিশুর জন্মের পর তার টিকাকরণের যে তালিকা দেওয়া হয় তাতে ওই শব্দদুটো প্রায়ই নজরে পড়ে। এসেনশিয়াল টিকাগুলোর মধ্যে থাকে বিসিজি, ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন, হেপাটাইটিস বি, মিজলস, টাইফয়েড, ডিপিটি ইত্যাদি। অপশনাল এর তালিকায় থাকে নিউমোকক্কাল, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ভেরিসেল ভ্যাকসিন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হয় সমস্ত টিকাই সব শিশুর জন্য অপরিহার্য। যে সমস্ত শিশুর লো বার্থ ডিফেক্টস থাকে, বার বার চেস্ট ইনফেকশন হয় তাদের ক্ষেত্রে অপশনাল বলে কিছু থাকে না। সব টিকাই অপরিহার্য।

একসঙ্গে কতগুলো ভ্যাকসিন দেওয়া যায়

এক সঙ্গে ৫-৬টা ভ্যাকসিন দেওয়া যায়। এতে শিশুর কোনও ক্ষতি হয় না।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে কি

বেশিরভাগ প্রতিষেধক টিকারই কিছু না কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকে। যেমন, অল্প স্বল্প জ্বর, ব্যথা, যেখানে ভ্যাকসিন দেওয়া হল সেই জায়গাটা লাল হয়ে যাওয়া, ইত্যাদি। তবে কোনও টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াই জীবন বিপর্যয় ঘটায় না।

অপশনাল ভ্যাকসিন

১৮ মাস থেকে ২ বছর : হেপাটাইটিস-এ। বুস্টার ডোজ দিতে হবে এর ৬ মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে।

২ বছর : চিকেন পক্স ভ্যাকসিন।

নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন

সাধারণভাবে বলা হয় জন্মের পর পরই দিতে। যদিও দেরিতেও দেওয়া যায়। তবে যে কারণে নিউমোনিয়া হয় অর্থাৎ স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনি সংক্রমণের থেকে রক্ষা করার হাতিয়ার এই ভ্যাকসিন। ২, ৫ বা ৭ বছরেও দেওয়া যায় এই ভ্যাকসিন।

তবে যাদের বার বার গলা, বুকে ইনফেকশন হয়, হৃদযন্ত্রে কোনও সমস্যা থাকে, তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ভ্যাকসিন দেওয়া দরকার।

কখন ভ্যাকসিন দেওয়া যায় না

শিশুর যদি খুব বেশি মাত্রায় জ্বর থাকে এবং পেট খারাপ হয় তাহলে কোনও ভ্যাকসিন দেওয়া উচিত নয়। তবে সর্দিকাশির সঙ্গে অল্পসল্প জ্বর থাকলে ভ্যাকসিন দিতে কোনও বাধা নেই। এছাড়া যে সব শিশুর এইচ আই ভি এডস, বা কিডনি ফেলিওর এর সমস্যা থাকে, ইমিউনিটি কম থাকে তাদের পালস পোলিও, মিজলস দেওয়া যায় না।

মেয়েদের ভ্যাকসিন

মেয়েদের জরায়ু মুখের ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্য এখন দেওয়া যায় এইচ পি ভি ভ্যাকসিন। হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস যা জরায়ুমুখের ক্যান্সারের জন্য দায়ী। এই ভ্যাকসিন তা প্রতিরোধ করতে সক্ষম। সাধারণত প্রথম ডোজ দেওয়া হয় শিশুর ৯ বছর বয়সে। প্রথম ডোজ দেওয়ার চার সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় এবং ৬ মাস পরে তৃতীয় ডোজ দিতে হয়। তবে ৯ বছরের পরে, যতক্ষণ না কোনও মেয়ে সেক্সুয়ালি অ্যাকটিভ, অর্থাৎ যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই ভ্যাকসিন দেওয়া যায়।

প্রোবায়োটিক-এর ভূমিকা

শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় প্রো-বায়োটিকের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এ নিয়ে এখনও অনেক সমীক্ষা চলছে। তা হলেও দেখা গিয়েছে ডায়ারিয়া প্রতিরোধ এবং এর জটিলতা কমাতে প্রোবায়োটিক খুব ভাল কাজ দেয়। এমনকী এইচ আই ভি সংক্রমণ থাকা শিশুদেরও প্রোবায়োটিক দিলে কোনও অসুবিধা হয় না, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। মাইল্ড ডায়ারিয়ায়, কিছু কিছু ভাইরাস যা সর্দিকাশির সঙ্গে সঙ্গে পেট খারাপেরও কারণ সেইসব প্রতিরোধেও খুব ভাল কাজ করে প্রোবায়োটিক। প্রোবায়োটিক ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারলে অনেক সময়ই অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে ফোন করুন ৯০৫১২ ৯৯০৬০ নাম্বারে

কোন টিকা কখন

জন্মের পর : বি সি জি, ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন হেপাটাইটিস বি (১)
৪-৬ সপ্তাহ : ডিপিটি (১), হেপাটাইটিস বি (২) এইচ আই বি (ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন)
১০ সপ্তাহ : ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন, ডিপিটি (২)
১৪ সপ্তাহ : ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন, ডিপিটি (৩) হেপাটাইটিস বি (৩)
৯ মাস : মিজলস ভ্যাকসিন।
১৫ মাস : ডিপিটি বুস্টার ডোজ, এম এম আর
২৪ মাস : টাইফয়েড, ৩ বছর অন্তর ২টো ডোজ দিতে হয়।
৫ বছর : এম এম আর, ডি টি।
১০ বছরে : একটা টিটেনাস।

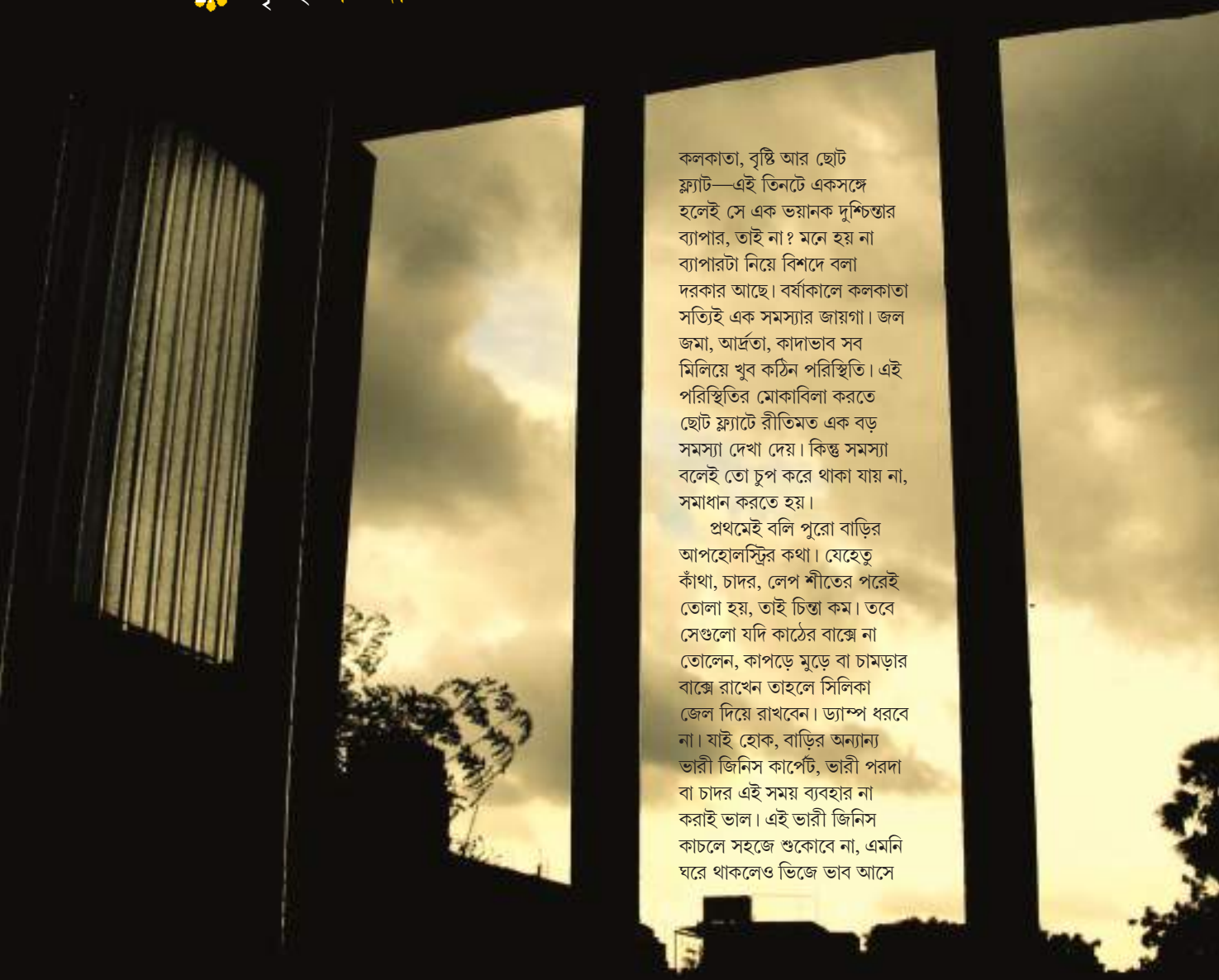

বর্ষার সাজ ও যত্ন

বর্ষাকালে অন্দরমহল সাজাবেন কী করে জানাচ্ছেন **সাবর্ণী দাস**

কলকাতা, বৃষ্টি আর ছোট ফ্ল্যাট—এই তিনটে একসঙ্গে হলেই সে এক ভয়ানক দুশ্চিন্তার ব্যাপার, তাই না? মনে হয় না ব্যাপারটা নিয়ে বিশদে বলা দরকার আছে। বর্ষাকালে কলকাতা সত্যিই এক সমস্যার জায়গা। জল জমা, আর্দ্রতা, কাদাভাব সব মিলিয়ে খুব কঠিন পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে ছোট ফ্ল্যাটে রীতিমত এক বড় সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু সমস্যা বলেই তো চুপ করে থাকা যায় না, সমাধান করতে হয়।

প্রথমেই বলি পুরো বাড়ির আপহোলস্ট্রির কথা। যেহেতু কাঁথা, চাদর, লেপ শীতের পরেই তোলা হয়, তাই চিন্তা কম। তবে সেগুলো যদি কাঠের বাক্সে না তোলেন, কাপড়ে মুড়ে বা চামড়ার বাক্সে রাখেন তাহলে সিলিকা জেল দিয়ে রাখবেন। ড্যাম্প ধরবে না। যাই হোক, বাড়ির অন্যান্য ভারী জিনিস কার্পেট, ভারী পরদা বা চাদর এই সময় ব্যবহার না করাই ভাল। এই ভারী জিনিস কাচলে সহজে শুকোবে না, এমনি ঘরে থাকলেও ভিজে ভাব আসে

বাথরুমেও ভিজেভাব দূর করার প্রয়োজন এই সময়। অবশ্যই মানিপ্লান্ট রাখুন। বাথরুম শুকনো থাকবে। গাছের এই ব্যবহার স্যাঁতসেতে ভাব তো দূর করবেই সেই সঙ্গে ঘরের সৌন্দর্যও বাড়াবে।

এবং ধরে রাখে, ফলে ড্যাম্প-এর গন্ধ হয়। তাই কার্পেট তো বটেই পারলে ভারী চাদর ও পরদা রোদে দিয়ে তুলে রাখুন। বদলে হালকা লেসের বা সিন্থেটিক কিংবা পাতলা সুতির পরদা ব্যবহার করুন। পরদাতে যেন লাইনিং না থাকে। চাদরের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। হালকা চাদর ব্যবহার করুন। তবে এগুলো যেমন তেমন করে কিনে ফেলবেন না। আপনার বাড়ির বাকি সব কিছুর সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই বর্ষার সাজে সাজাতে হবে।

একইসঙ্গে নিতে হবে আরও কতগুলি পথ, যা বর্ষায় আপনার বাড়িকে স্যাঁতস্যাতে ভাব থেকে রক্ষা করবে। প্রথম ধাপ তো আগেই আলোচনা হল— ভারী আপহোলস্ট্রি সরানো, বদলে হালকা জিনিস ব্যবহার করা। এর পরের ধাপ অবশ্যই গাছ রাখা। ঘরের কোণে, বই-এর তাকে, সোফার পিছনে—যেখানেই সম্ভব সুন্দর গাছ রাখুন। টবে জল দেবেন না। বাতাসের আর্দ্রতা মাটি টেনে নেবে। এতে ঘরের ভিজেভাব কমবে। তবে মাঝে-মাঝেই টবের মাটি পরীক্ষা করে দেখবেন বেশি শুকিয়ে গেছে কি না। প্রয়োজনে তাহলে সামান্য জল দিতে হবে। বাথরুমেও ভিজেভাব দূর করার প্রয়োজন এই সময়। অবশ্যই মানিপ্লান্ট রাখুন। বাথরুম শুকনো থাকবে। গাছের এই ব্যবহার স্যাঁতসেতে ভাব তো দূর করবেই সেই সঙ্গে ঘরের সৌন্দর্যও বাড়াবে। তবে যে ঘরে শোবেন (বেডরুম ছাড়াও অনেক সময় অন্য ঘর শোয়ার জন্যও ব্যবহার করা হয়। যেমন ড্রইংরুমের সোফা কাম বেড) সেই ঘর থেকে রাতে গাছ সরিয়ে দেবেন। বারান্দা বা ছাদে পাঠিয়ে দেবেন। গাছও খোলা হাওয়া বাতাস পাবে, আপনিও ভাল থাকবেন।

বর্ষার সময় সব থেকে বেশি সমস্যার জায়গা মেঝে। কাদা, জল সব কিছু মিলিয়ে দেখতে খারাপ লাগে। তাই রাবারের পাপোস এই সময় অবশ্যই ফ্ল্যাটে ঢোকার মুখে লাগাবেন। এতে জুতোর কাদা এখানে মুছে যাবে। তবে প্রতিটি দরজার সামনে জুট পাপোস দেওয়া দরকার। ভিজে ভাবটা টেনে নেবে। বর্ষার সময় কিন্তু বাইরে থেকে ফিরে জুতো খুলে ঘরে ঢোকা উচিত, তা না হলে ঘরদোর খুব নোংরা হয়ে যায়। অস্বাস্থ্যকরও বটে।

গ্রাউন্ড ফ্লোরে যাঁরা থাকেন এই সময়টা তাঁদের কাছে সুসময় নয়। যাঁদের বাড়িতে জল জমার প্রবণতা আছে তাঁদের তো সম্পূর্ণ নতুন করে সব ব্যবস্থা নিতে হবে। মেঝেতে রাখা সব জিনিস সরিয়ে ফেলতে হবে। মেঝেতে শোয়ার বা বসার পাট তুলে দিতে হবে। দরকার হলে কোনও চৌকি বা চারপাই ভাড়া নিয়ে নতুন করে ঘর সাজানোর পরিকল্পনা করতে পারেন।

ঘরটা দেখতেও নতুন লাগবে। বর্ষার সমস্যাও কমবে।

যতই বৃষ্টি পড়ুক, গরম কিন্তু থাকে। তাই বর্ষায় ফ্যাশনেবল হতে শিফন-এর উপর ক্রোশে করা মিনি ড্রেসটি অনবদ্য। হাতে মাদার অফ পার্লস-এর চুড়ি, পায়ে ফ্লোটার্স।

রঙ বেরং-এর ছাতা নিয়ে বেরলে সঙ্গের পোশাকটা একরঙা হওয়াই উচিত। যেমন পড়েছে ষোড়শী। একেবারে হালকা রঙের শরীর বেষ্টন করা জামা, পায়ে ধূসর ব্যালে, আর রং আনতে হাতে কাঠের ও সেরামিকস-এর চুড়ি।

সাদা কালো বড় ভাল, এটা আবার প্রমাণিত হল, চেক জামার সঙ্গে ছোট কোটি যোগ হয়ে। কানে লাল পালকের দুল, আঙুলে লাল আংটি, আর পায়ে সাদা কালো ফুলছাপ হাওয়াই—হাওয়ায় উড়ছে ষোড়শী।

বর্ষায় ষোড়শী

কলকাতা আর বর্ষা বেশ একটা অভিজ্ঞতা। জল জমা, কাদা, ভ্যাপসা গরম সব মিলিয়ে একটা অন্য উন্মাদনা। এর মধ্যে হালফ্যাশন-এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা যে সে ব্যাপার নয়। তবে পরিবর্তন তো আনতেই হবে, বিশেষ করে সাজে। এবার দেখব, আজকের প্রজন্মের কাছে বর্ষার সাজ কী ও কেমন, জানাচ্ছেন **সাবর্ণী দাস**

প্রসাধন : অভিজিৎ কয়াল, মডেল : জোয়া, ছবি : অরিজিৎ দত্ত

বর্ষায় শাড়ি পরলে তা সিন্থেটিক হওয়ায়ই কাম্য। কারণ তাড়াতাড়ি শুকোয় আর জলে নেতিয়ে যায় না। তবে শাড়ি পরলেও পরা চাই আধুনিক স্টাইলে। যেমন পড়েছে ষোড়শী, সরু স্ট্র্যাপের ব্লাউজ দিয়ে। আর সঙ্গে বৈচিত্র্য আনতে একেবারে কন্ট্রাস্ট গয়না। ফিরোজা দুল ও হার।

আয়ুর্বেদে সুগন্ধী থাকুন

শরীরের দুর্গন্ধ দূর করার বেশ কিছু আয়ুর্বেদিক পদ্ধতির কথা জানালেন, আয়ুর্বেদাচার্য অমল কান্তি ভট্টাচার্য

স্বেদগ্রন্থি থেকে ঠিকমতো ঘাম না বেরলে গায়ে গন্ধ হতে পারে। আবার কন্ট্যাক্ট ডার্মাটাইটিস, সোরিয়াসিস কিংবা পাচক প্রক্রিয়ার গন্ডগোলের জন্যও এমন সমস্যা হতে পারে। গায়ে দুর্গন্ধের আরেকটা কারণ হতে পারে জল কম খাওয়া। গরমের সময় শরীরে বেশি পরিমাণে জলের যোগান দেওয়া দরকার। শরীরের চাহিদা মতো জল না খেলে ঘাম থেকে শরীরে দুর্গন্ধ হতে পারে। এই দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যা যা করা যেতে পারে তা হল

- সঠিক মাত্রায় জল খেতে হবে।
- বেশি জল দিয়ে স্নান করতে হবে।
- কাঁচা হলুদ ও নিমপাতা বাটা একসঙ্গে মিশিয়ে স্নানের আগে মেখে, পাঁচ মিনিট পর স্নান করলে, অনেক সংক্রমণ থেকে দূরে থাকা যায়।
- থানকুনি পাতা বাটা আধ চামচ, কুলেখাড়া পাতা বাটা আধ চামচ পরিমাণে নিয়ে ধনে ও মৌরি ভেজানো জল দিয়ে খেলেও বেশ উপকার পাওয়া যায়।
- স্নানের পর প্রতিদিন নিম ও চন্দন পাউডার ব্যবহার করলেও খুব ভাল ফল পাওয়া যায়।
- বড় এলাচ বেটে তা সারা গায়ে মাখলেও উপকার পাবেন।
- জটামাংসী বেটে স্নানের আগে গায়ে মাখলেও গায়ের গন্ধ দূর হয়।
- ঘন করে বেনামূল বাটা গায়ে মেখে আধঘণ্টা পর ধুয়ে ফেললেও গায়ের দুর্গন্ধ চলে যায়।
- মঞ্জিষ্ঠারিষ্ঠ, উষিরাশও কিংবা বাবুলারিষ্ঠ এই তিনটির যে কোনও একটার রেডিমেড পাউডার চার চামচ করে দুবেলা মাসখানেক খেলেও গায়ের দুর্গন্ধ দূর করতে ভাল কাজ দেয়।
- নিম শ্যাম্পুও গায়ের দুর্গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে।

দেশজ উপায়

ঘাম থেকে দুর্গন্ধ রোধের উপায় জানাচ্ছেন রূপ বিশেষজ্ঞ স্বাতী দত্ত

আমাদের দেশে বছরের বেশির ভাগ সময়েই গরম। বৈশাখ থেকে ভাদ্র অবধি তো কথাই নেই। এই প্রচণ্ড গরমের সময় শরীর থেকে ঘাম বেরনোটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। ঘামের সঙ্গে আমাদের শরীরের অনেক দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যায়, আবার ঘাম থেকে দুর্গন্ধও হয়। যদি ঘামের ফলে শরীরে জীবাণু সংক্রমণ হয় কিংবা ত্বকের ওপরের স্তরে কোনও পরিবর্তন আসে তাহলেও শরীরে গন্ধ হয়। কিছু কিছু অসুখের জন্য যেমন স্কার্ভি, জ্বর ইত্যাদিতে আক্রান্ত হলেও ঘামে দুর্গন্ধ হয়। রসুন খেলেও ঘামে দুর্গন্ধ বের হয়। তাই দুর্গন্ধ রোধ করার জন্য যা যা করা যেতে পারে সেগুলো হল

● এ সময় সুতির ঢিলেঢালা পোশাক পরা উচিত। তাতে ঘাম কম হবে। ফলে কমবে দুর্গন্ধও।

● সারাদিন এক জামাকাপড় পরে না থেকে ২-৩ বার পাল্টানো উচিত।

● নিশিন্দা, তেজপাতা গুঁড়ো, ১ চামচ করে এবং আধ চামচ করে সাদা চন্দন, দারু হরিদ্রা গরম জলে ফুটিয়ে দিনে ১বার স্নানের আগে গায়ে মাখলে দুর্গন্ধ রোধ করা যায়।

● ১ চামচ করে লজ্জাবতী, বকুল, ছাতিম ও আধ চামচ চিরতা গরম জলে ফুটিয়ে স্নানের আগে গায়ে মাখলেও উপকার পাবেন।

● হিঞ্চে শাক সেদ্ধ করে ওই রস গায়ে মাখলে এবং সকাল বেলা হিঞ্চে শাকের রস দু চামচ করে খালি পেটে খেলে ভাল কাজ দেবে।

● কয়েকটা বেলপাতা, ১চামচ লোদ, আধ চামচ কুড় জলে সেদ্ধ করে ওই জলে গা ধুলে ঘাম ও দুর্গন্ধ দুটোই রোধ করা যায়।

● ১ চামচ লাল চন্দন গরম জলে দিয়ে স্নানের জলে নামী কোনও কোম্পানির ওডিকোলন ফেলে তা দিয়ে গা ধুলেও দুর্গন্ধ দূর হয়।

● যাঁদের বেশি ঘাম ও তার থেকে দুর্গন্ধ বের হয় তাঁদের বেশি ভাজাভুজি না খাওয়াই ভাল। সহজ পাচ্য খাবারই সব সময় খাওয়া দরকার।

স্বাতী দত্তর সঙ্গে যোগাযোগ : ৯৮৩০৯৮৮৩৩৮

ঘাম ও শারীরিক দুর্গন্ধ

গ্রীষ্মে প্রধান সমস্যা ঘাম এবং তার থেকে দুর্গন্ধ। এই সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়ার সহজ উপায় জানালেন বিশিষ্ট ত্বক বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুব্রত মালাকার।

গরমের সময় চারপাশের উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে শরীরও গরম হয়ে যায়। তখন শরীর থেকে বাষ্পের আকারে জল বেরিয়ে আমাদের ত্বকের ওপরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এতে আমাদের শরীর ঠাণ্ডা হয়। বাষ্পায়নের আকারে এই জল বেরোনোকেই বলা হয় ঘাম। তাই এই ঘাম বেরলে তা বন্ধ করা বা কমানো ঠিক নয়।

ঘাম শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ঘাম না হলে শরীর গরম হয়ে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। তবে অস্বাভাবিকরকম ঘাম হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

ঘাম ত্বকের কোনও ক্ষতি করে না। তবে শরীরের কোথাও ঘাম জমে গেলে তার থেকে ফাংগাল ইনফেকশন হতে পারে। এই কারণে ঘাম জমতে না দেওয়ার জন্য গরমের আদর্শ পোশাক হল সুতির পোশাক। এতে ঘাম জমতে পারে না।

ঘামের পরিমাণ না কমিয়ে এর থেকে হওয়া দুর্গন্ধ প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত প্রত্যেকের। দুর্গন্ধ দূরে রাখতে ব্যবহার করা যেতে পারে ডিওডারেন্ট। ডিওডারেন্ট শুধু ঘামের দুর্গন্ধই আটকায় না, দুর্গন্ধ ছড়ানোর জন্য দায়ী জীবাণুদের বংশবৃদ্ধি আটকে আবার গন্ধ হওয়া প্রতিরোধ করে। বিভিন্ন ফর্মে এই ডিওডারেন্ট পাওয়া যায়। যেমন স্প্রে, রোল ওন, লোশন, ক্রিম, যে কোনওটাই ব্যবহার করা যেতে পারে।

কোনও ডিওডারেন্ট ব্যবহারের পর অ্যালার্জি হলে সেটা ব্যবহার করা উচিত নয়। পরিবর্তে অন্য কোনও ব্র্যান্ডের অন্য কোনও গন্ধের ডিও ব্যবহার করা উচিত।

ঘামের দুর্গন্ধ দূর করতে পারফিউমও ব্যবহার করা যেতে পারে। পারফিউম দুর্গন্ধ দূর করলেও ঘামের গন্ধের জন্য দায়ী জীবাণুদের প্রতিরোধ করে না।

ঘাম এবং দুর্গন্ধ দুই-এর প্রতিরোধের জন্য অনেকে ট্যালকম পাউডার লাগান এতে ঘর্মগ্রন্থির মুখ আটকে গিয়ে ঘাম হওয়া বন্ধ হয়। কিন্তু ঘাম শরীর থেকে বেরতে না পারলে শরীর খারাপ হয়। কাজেই ট্যালকম পাউডার ব্যবহার না করাই সমীচীন।

গরমে ঘামের দুর্গন্ধ থেকে নিষ্কৃতি পেতে প্রতিদিন অন্তত দুবার সাবান বা শাওয়ার জেল মেখে স্নান করা উচিত। গায়ে যাতে ঘাম বসতে না পারে তাই বার বার গা মোছা দরকার।

বি শে ষ র চ না

বর্ষার উৎসব

বর্ষার নানা রূপ আমাদের মুগ্ধ করে। এই বর্ষায়ই পালিত হয় নানা উৎসব, পার্বণ। সেই উৎসব নিয়েই আলোচনা করেছেন প্রীতিকণা পালরায়

চিত্ত আমার হারালো আজ মেঘের মাঝখানে
কোথায় ছুটে চলেছে সে কোথায় কে জানে
বিজলি তার বীণার তারে আঘাত করে বারে বারে
বুকের মাঝে বজ্র বাজে কী মহাতালে।

কবির কল্পনাতে এভাবে বর্ষার রূপ ধরা পড়া আর অফিস ফেরত বাড়িমুখো ছাপোষা মধ্যবিত্তকুলের আচমকা বৃষ্টির মুখোমুখি হওয়ার ভাবনা কখনওই এক হতে পারে না। বিশেষত শহর কলকাতায়। তা বলে বেরসিক ভাববেন না। প্যাচপেচে গরমের পর, ল্যাতপেতে কাদা পায়ে মেখে, ঘাম আর বৃষ্টি মিলেমিশে এক হয়ে যাওয়া জামা গায়ে, দীর্ঘ যানজটের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকতে থাকতেও আমরা বর্ষাটাকে ভালবাসি। FM স্টেশনে দ্রুত জড়ো করা একের পর এক বর্ষার গান শুনতে শুনতে বাস্তব ভুলে থোড়া সা রোম্যান্টিক হওয়ার চেষ্টাও করি (সব বয়সের সবাই)! তাই গন্তব্যে পৌঁছনোটা সামান্য অনিশ্চিত হলেও মনে মনে ভাবি বর্ষা শেষমেশ এল তাহলে!

শহর থেকে সরে আরেকটু বিস্তৃত দৃষ্টিতে দেখলে বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কিছুই চোখে পড়বে। বিশ্ব ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও, প্রকৃতির রকম সকম ক্রমশ পাল্টে যেতে থাকলেও, সংস্কারে বিশ্বাসী বাঙালি কিন্তু আজও একইরকম। তাই ঝমঝম বা ঝিরঝিরে বৃষ্টির মাঝেও কিন্তু তার ব্রত পালনে, পুজো পার্বণে, উৎসব উদযাপনে কোনও ক্লান্তি নেই। আসুন এক ঝলকে আমরা এ ঋতুর প্রধান উৎসবগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিই।

পূর্ণিমা পুণ্যতিথি। প্রতি পূর্ণিমাতেই কিছু ধর্মকার্য হয়ে থাকে লোকমতে। কিন্তু শ্রাবণের পূর্ণিমায় ধর্মোৎসবের বিশেষ বৈচিত্র দেখা যায়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নানা ধরনের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাংলায় এদিন ঝুলনযাত্রার সমাপ্তি। শ্রাবণের শুক্লা একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত এই উৎসব চলে। ঝুলনযাত্রা বা

জন্মাষ্টমী

আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষাকাল। ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বর্ষাকালে না পড়লেও, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী অর্থাৎ 'জন্মাষ্টমী' উৎসবের সঙ্গে বর্ষা ও ভারী বৃষ্টি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। কে না জানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এক তুমুল বর্ষা রাতে। তাই ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে নন্দোৎসব পালিত হয় এই বর্ষাকালেই। বাংলাদেশে এদিন দই-এর হাঁড়ি মাথায় নিয়ে নাচতে নাচতে তা ভেঙে ফেলে দই-কাদার সৃষ্টি করা হয়। পশ্চিম ভারতে শ্রীকৃষ্ণ লীলা অনুষ্ঠিত হয় প্রায় প্রতি পাড়ায়। উপোস থেকে শ্রীকৃষ্ণের পুজো করে, তাঁর পছন্দের খাবার বানিয়ে জন্মাষ্টমী ব্রত পালনের লৌকিক বিধান প্রায় প্রতি ঘরে পালিত হয়।

হিন্দোলযাত্রার প্রচলন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান হিসেবে নয়, লৌকিক উৎসবের দিকটাই প্রধান। রাধা-কৃষ্ণের ভালবাসা এবং জীবনের নানা রঙের প্রতি ভগবান কৃষ্ণের প্রেম এবং আকাঙ্খাই এই অনুষ্ঠানের মূল উপজীব্য। একসময় শুধু ব্রজধামে ঝুলন উৎসব পালনের চল ছিল, বর্তমানে তা বাংলার ঘরে ঘরে হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঝুলন সাজিয়ে প্রভূত মজা করে থাকে। দোলায় রাধাকৃষ্ণকে দোলানোই এই অনুষ্ঠানের মূল কাজ বলে মনে করা হয়।

পশ্চিম ভারতে এবং দক্ষিণ ভারতে এদিন নারকেল দিবস এবং সমুদ্রপূজা অনুষ্ঠিত হলেও উত্তর ভারতে রক্ষাবন্ধন বা রাখি বন্ধনের ধুম বেশি। বাংলাদেশে রাখি মূলত ঐক্যের উৎসব হলেও ভারতের অন্য প্রদেশে, বিশেষত বিহার ও উত্তরপ্রদেশে এটি একটি বিশেষ জনপ্রিয় উৎসব। এই উপলক্ষে মঙ্গল কামনা করে একজন আরেকজনের হাতে রাখি বা মঙ্গলসূত্র বেঁধে দেয়। ভাই-বোন পরস্পরকে উপহার দেয়। বিশেষভাবে খাওয়া দাওয়া হয়। উত্তর ভারতের রাখি পূর্ণিমাই পশ্চিমভারতে নারকেল পূর্ণিমা। এই উপলক্ষে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হয়ে সমুদ্র পুজো করা হয় ও সমুদ্রে নারকেল ছোঁড়া হয়। দক্ষিণ ভারতে এর সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি শাস্ত্রীয় আচার আছে। এদিন পুরনো উপবীত ত্যাগ করে ব্রাহ্মণেরা নতুন উপবীত ধারণ করে। দেবতা, ঋষি ও পিতৃপুরুষদের তর্পণ করা এবং বেদমন্ত্র আবৃত্তি করা উৎসবের মূল অনুষ্ঠান। শ্রাবণ পূর্ণিমার কিছু পরে কেরলে 'ওনম' নামে একটি অনুষ্ঠান হয় যা কেরলের 'নবান্ন' বলা যেতে পারে। ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান সর্বসাধারণের জন্য এ অনুষ্ঠান।

ভারতের নানা অংশে এসময় নানাভাবে সাড়ম্বরে সর্পপূজার অনুষ্ঠান হয়। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী প্রসিদ্ধই নাগপঞ্চমী হিসেবে। বাংলাদেশে ও মিথিলায় এদিন সর্পভয় নিবারণের জন্য মনসাদেবী ও অষ্টনাগের (অনন্ত, বাসুকি, শঙ্খ, পদ্ম প্রভৃতি) পূজার প্রচলন আছে। এইসময় দেবী সিজ বা মনসা গাছকে আশ্রয় করে থাকেন। তাই উঠোনে ওই গাছ পুঁতে তার ওপর পুজো করার বিধান। পোঁতা সিজের বা ঘরের দরজার দু'পাশে গোবর দিয়ে সাপের মূর্তি তৈরি করা হয়। কোথাও আঁকা হয় সাপ, কোথাও আবার জীবিত সাপের পুজোও হয়। আষাঢ় মাসে বাংলার ঘরে

ঘরে খুব জনপ্রিয় একটি ব্রতর চল আছে। তা হল বিপত্তারিণী ব্রত। বিপত্তারিণী নামে দূর্গার এক কল্পিত বিশেষ রূপকে অবলম্বন করে এই ব্রত পালন করা হয়। শাস্ত্রে এর কোনওই উল্লেখ নেই, একেবারেই একটি লৌকিক ব্রত এটি। তবে ব্রতকথা সংস্কৃতে লেখা এবং বেশ মজার। এক রাজরানির গোমাংস দেখার ইচ্ছে হলে তিনি সখি চর্মকার পত্নীদের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করেন। রাজা জানতে পেরে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে ভীত রানির প্রার্থনায় গোমাংস ফল-ফুলে পরিণত হলে রাজা তা দেখে তুষ্ট হন। এই ব্রত আষাঢ় মাসে রথ দ্বিতীয়ার পর দশমীর মধ্যে যে কোনও শনি-মঙ্গলবারে করা হয়। চালের তৈরি তেরোটি পিঠে, তেরোটি পানসুপুরি, তেরোটি ফল দরকার হয়, ডান হাতে লাল সুতোর তেরোটি গ্রন্থিযুক্ত ডোর ধারণ করতে হয়।

তবে এই সময়ের প্রধান এবং সবচেয়ে বিখ্যাত উৎসব হল রথযাত্রা। আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জগন্নাথদেব, বোন সুভদ্রা ও দাদা বলরাম বা বলভদ্রকে নিয়ে রথে চড়ে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী গুন্ডিচার বাড়ি যান। সেখান থেকে সাতদিন পরে আবার নিজের মন্দিরে ফিরে আসেন। তিনটি রথ যাত্রা করে মাসির বাড়ি। প্রথমে বলরামের রথ, তারপর সুভদ্রা এবং সবশেষে মহাপ্রভু জগন্নাথের রথ। রথে চড়ে এই গমন (সোজারথ) এবং প্রত্যাগমন (উল্টোরথ) সম্ভবত সূচনা হয়েছিল শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচল অর্থাৎ পুরী যাওয়ার পর। হিন্দুদের কাছে অতি শুভদিন এটা তাই বহু শুভ কাজের সূচনা এদিন করা হয়। দূর্গাপুজোর সূচনাও হয় ওই রথ কিংবা উল্টোরথের দিন। বাংলাতেও সাড়ম্বরে রথযাত্রা পালিত হয় অনেক জায়গায়, যেমন মহেশের রথযাত্রা।

এভাবেই বর্ষাঋতুকে নানা ব্রত-উৎসব পালনের মধ্যে দিয়ে সাজিয়ে রাখে বাঙালি।

সজল মেঘের কোমল কালোয় অরুণ আলো মেশে...
রঙের ধারায় হৃদয় হারায়, কোথা সে যায় ভেসে...।

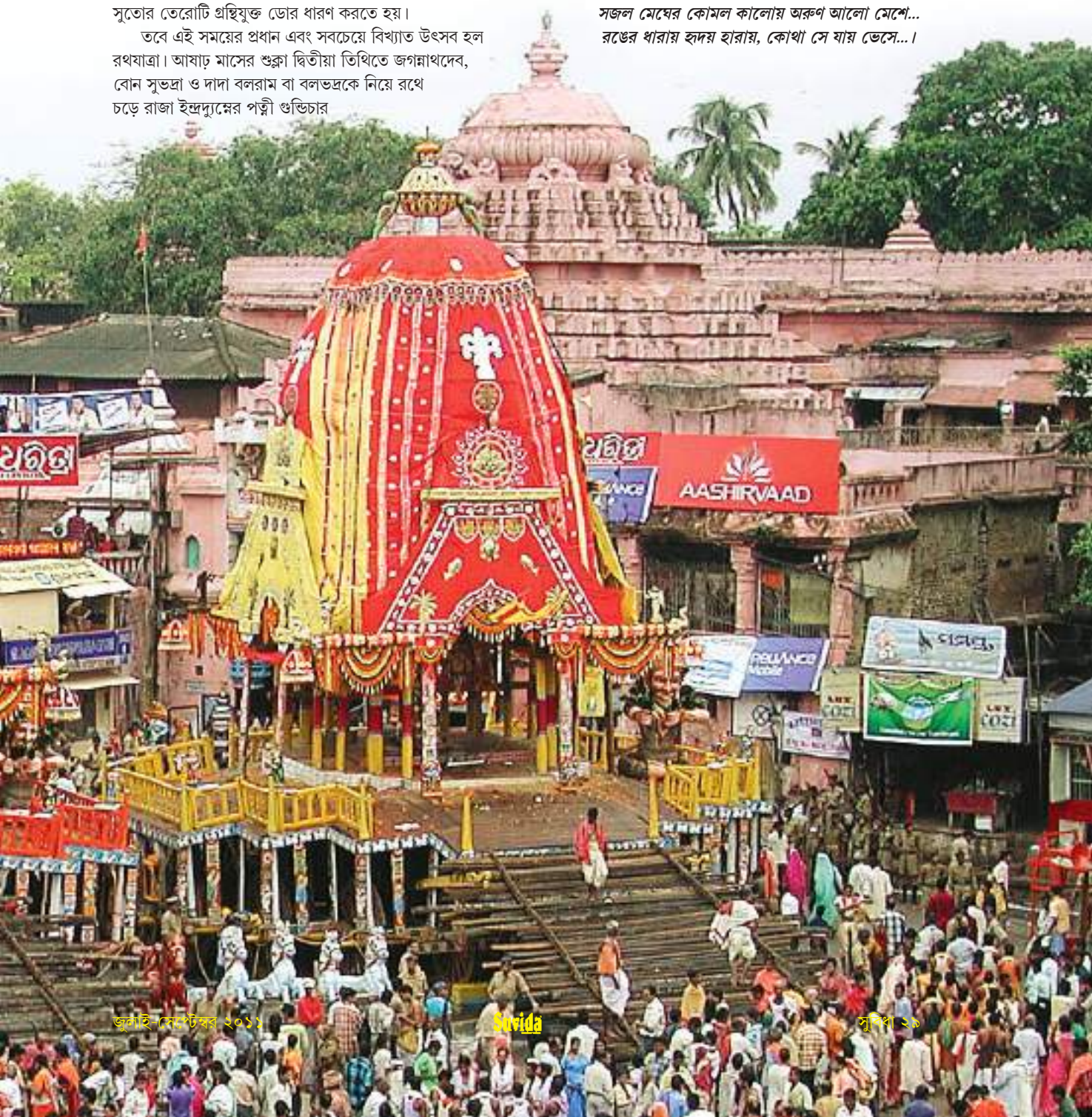

জঙ্গলের কোলে প্রকৃতির মাঝে

সিমলিপাল ও বাঙ্গরিপোসি বেড়ানোর সুখকর স্মৃতিচারণ করেছেন চিন্ময় দাস। আপনারাও যাতে যেতে পারেন তারও সব তথ্য দিয়েছেন। কারণ ভ্রমণের আনন্দ ভাগ করে নিতে চান তিনি সবার সঙ্গে।

ঠিকই বলেছিলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'ভ্রমণ করা এক, তা প্রকাশ করা আর এক। যাহার পা-দুটো আছে, সেই ভ্রমণ করিতে পারে, কিন্তু হাত দুটো থাকিলেই তো আর লেখা যায় না। সারা জীবনের আনন্দ পেতে হলে দেশ ভ্রমণকে সঙ্গী কর।' আমিও সেই মন্ত্রেই দীক্ষিত হতে দু-এক দিনের ছুটি পেলেই ব্যস্ত জীবনের প্রাত্যহিক টানাপোড়েন উপেক্ষা করে ক্যামেরা হাতে বেরিয়ে পরি। দেশ ভ্রমণ বা বলতে পারেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে নতুন করে আবিষ্কারের নেশায়। আমাকে যেন সদাসর্বদা প্রকৃতি ডাকে তার কোলে ক্ষণিকের আনন্দ উপভোগ করতে যাওয়ার জন্য। আমিও সেই ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারি না। এবারও দুদিনের ছুটিতে কোথায় যাব, কোথায় যাব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হল কেমন হয় যদি সিমলিপাল বাঙ্গরিপোসি ঘুরে আসি। সম্পূর্ণ খবর নেওয়ার জন্য আমি চলে যাই Orissa Tourism-এর দপ্তর, Utkal Bhawan-এ। ভাবছেন ঠিকানা না জানলে যাবেন কীভাবে? ঠিকানাটা হল, Utkal Bhawan, 56 Lenin Sarani, Kolkata-700013, প্রথমতল। মানে ওয়েলিংটনের মোড়ে। খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে বাঙ্গরিপোসিতে থাকার জন্য ওড়িশা পর্যটনের একটা বাংলো আছে। কিন্তু সেটি বন্ধ আছে, মেরামতের কাজ চলছে। তবে আর একটি থাকার জায়গা আছে সেটি হল সিমলিপাল রিসর্ট। তাই আমি সিমলিপাল রিসর্ট-এর ঘর বুক করে বেড়িয়ে পড়লাম। বাবুঘাট থেকে বাস-এ চড়ে বসলাম সকাল ৮টার সময়। সেই বাস বম্বে হাইরোড দিয়ে খড়্গপুর পার হয়ে ঝাড়্গ্রামের ছোট্ট একটা টুকরো পেরিয়ে ঢুকে পড়ল ওড়িশায়। আমরা সিমলিপালের গেটে যখন নামলাম তখন দ্বিপ্রহর। তাই কালব্যয় না করে একটি রোড সাইড ধাবায় খেতে চলে গেলাম। সেখানে আমাদের বাসের চালকসহ প্রায় সব যাত্রীরাই খাচ্ছিলেন। খাবার খুব সুস্বাদু ছিল তা বলতে পারি না, অবশ্য খিদের মুখে খেতে খুব খারাপ লাগেনি। খাবার খেয়ে চলে গেলাম আমাদের হোটেল সিমলিপাল রিসর্ট-এ। রিসর্ট-এর মালিক ভাষাবাবু সাদর অভ্যর্থনা করে আমাদের ঘর দেখিয়ে দিলেন। দোতলার উপর সুন্দর নয়নাভিরাম সুসজ্জিত মার্বেল বসানো ঘর তার সঙ্গে গরমজল, ঠাণ্ডা জলের যান্ত্রিক ব্যবস্থা সহ শৌচালয়। সত্যিই ভাবতে অবাক লাগে কলকাতা থেকে মাত্র ২২৮ কিমি দূরে N H 6 (মুম্বই রোড)-এর উপর এবং সিমলিপাল পর্বতমালার ঠাকুরানী পাহাড়ের পাদদেশে ব্লকসদর বাঙ্গরিপোসি, এর তিনদিকেই ঘিরে আছে সিমলিপাল জাতীয় উদ্যান। যার মধ্যে আছে সিমলিপাল ব্যাঘ্র প্রকল্প এবং এটি এখন ভারত সরকার দ্বারা সংরক্ষিত 'জৈবমণ্ডল' নামে বিখ্যাত। এখানে কিন্তু আমাদের চিড়িয়াখানার মতো মৃতপ্রায় বাঘ দেখতে পাবেন না। যদি ভাগ্য প্রসন্ন হয় তবে পাবেন সুন্দরবনের মতো সদা ব্যস্ত হিংস্র বাঘ। এখান থেকে ১ কিমি দূরে ইতিহাস খ্যাত বুড়িবালাম নদী। এই নদীর নয়নাভিরাম দৃশ্য ও লাল মাটির রাস্তা অবশ্যই আপনার মনকে আনন্দ দেবে। ২কিমি দূরে 'মা দ্বারশুনি' মন্দির, এখানে একটি সুন্দর ঝরনা বয়ে চলেছে মন্দিরের পাশ দিয়ে। এখান থেকে ৭০কিমি দূরে মহাভারত খ্যাত কালো গ্র্যানাইট পাথরের ওপর দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পশৈলীতে তৈরি রাজা কীচকের গৃহদেবী 'কীচকেশ্বরী মন্দির'। ইতিহাসকে চোখের সামনে দেখে পুরনো সেই দিনের কথা, স্মৃতি মলিন হলেও ফ্ল্যাশব্যাকে ভাস্বর অবশ্যই হবে। সিমলিপাল থেকে মাত্র ৭কিমি দূরে দেখতে পাবেন ইতিহাস খ্যাত আর একটি জায়গা যার নাম 'ডোকরা'। ডোকরা শুনেই মহিলাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ডোকরা কাজের গয়নার কথা। এখানেই থাকে ডোকরা শিল্পীরা। এঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং এইসব শিল্পীদের কর্ণধার হলেন মাননীয় যুধিষ্ঠিরবাবু। যুধিষ্ঠির বাবুর বাড়ির ছেলে, বউ, নাতি, নাতনি সকলেই ডোকরার কাজ করতে পারেন। আমাদের সামনেই ডোকরার কাজ করে দেখিয়ে দিলেন। আমরাও কিনে নিলাম কিছু অসাধারণ হস্তশিল্পের নিদর্শন। হোটেলে ফিরে সেগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলাম, দেখতেই লাগলাম। আর মনের মধ্যে একটা ব্যথা অনুভব করতে লাগলাম, একটি বিশেষ শিল্পের প্রায় লুপ্তপ্রায় অবস্থা এবং তার শিল্পীদের কথা ও তাঁদের অবস্থার কথা ভেবে। এই শিল্পীদের দুবেলা ভাল করে খাবারও জোটে না।

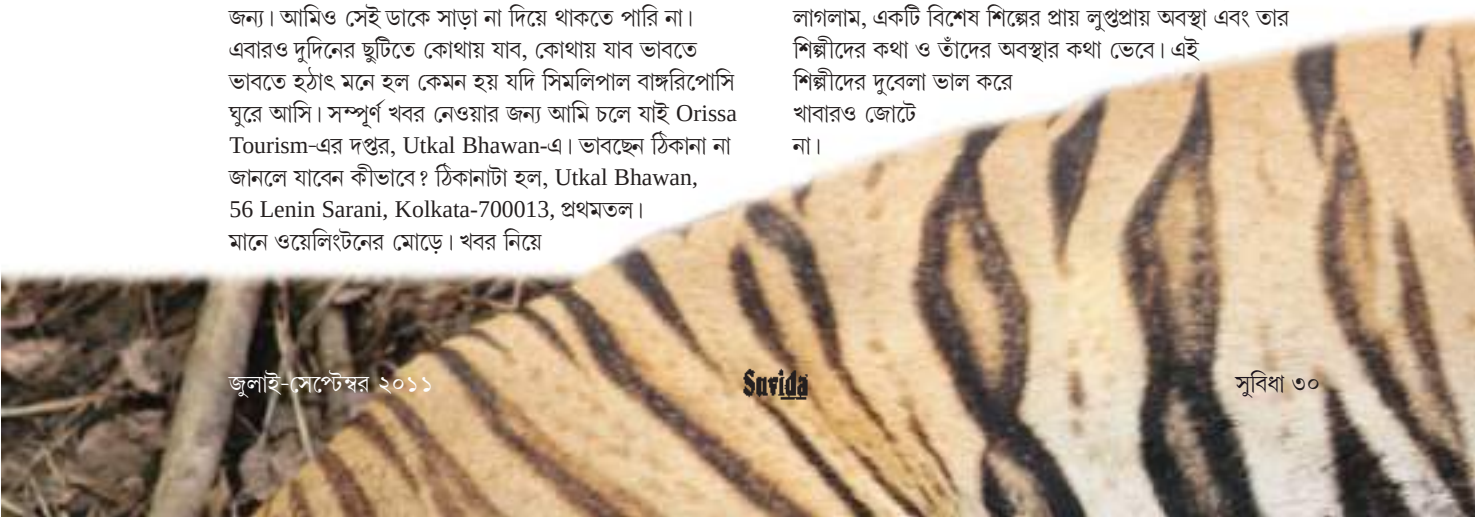

বাঙ্গরিপোসি যাওয়ার জন্য কলকাতার বাবুঘাট বা প্রেস ক্লাব থেকে অনেক বাস ছাড়ে।
কলকাতা-কেন্দুঝাড় : সকাল ৭টায় ; দাস অ্যান্ড দাস : দুপুর ১২.১৫তে ; নীলমাধব : দুপুর ১.৩০এ ; অনিন্দিতা : বিকেল ৩.১৫তে।
OSTC-র বাস ছাড়ে, বিকেল ৫.২৫এ।
বিশদ বিবরণের জন্য Utkal Bhawan কলকাতা ও সিমলিপাল রিসর্ট-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।
ফোন নং 9437612747 অথবা কলকাতায় : মিঃ রজত রায় 9748211337/8013540929

ছবি : লেখক

কিন্তু তাদের প্রাণচঞ্চলতা সত্যি বেঁচে থাকার রসদ জোগায়। পরদিন চলে গেলাম সিমলিপাল অরণ্যের মধ্যে ব্র্যাঘ্র-প্রকল্প দেখতে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা বিস্তীর্ণ অরণ্য। এখানকার উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র সত্যিই এক কল্পলোকে নিয়ে যাবে। ছোট বড় জল-প্রপাত এবং পাহাড়ের কোলে কোলে মুন্ডা ও সাঁওতালদের ছোট ছোট বসতি দেখতে দেখতে, তাঁদের সরল জীবন যাত্রা অবশ্যই আপনার মনে গভীর ছাপ ফেলবে। যদি সন্ধের পর ওখানে থাকতে পারেন, আর সময়টা যদি আদিবাসীদের পরবের সময় হয় তাহলে উপরি পাওনা হিসেবে দেখতে পাবেন আদিবাসী নৃত্য, গীত। এঁদের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, উৎসব আর ধামসা-মাদলের ধ্বনি আপনাকে দেবে এক আদিম প্রগৈতিহাসিক অনুভূতি। নাচের তালে তালে কখন যে আপনিও ওদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবেন বুঝতেই পারবেন না। সন্ধের পর ফিরে এলাম আমাদের হোটেলে, আর সারারাত যেন চোখে নাচগানের রেশ রয়েই গেল। পরদিন সকালে চললাম বাঙ্গরিপোসি শহরে। এখানে রয়েছে প্রাচীন রাধাকৃষ্ণ মন্দির যার গায়ে প্রাচ্য যুগের কারুকার্য খচিত। এই কারুকার্য দেখে মন ভরবে না, মনে হবে পুরো মন্দিরের সৌন্দর্য শুধু চোখের মধ্যে করেই নয় ক্যামেরা বন্দি করে নিয়ে আসবেন, আমিও নিয়ে এসেছি। এখান থেকে ২০০ গজ দূরে পাবেন একটি শিব মন্দির যার উচ্চতা ও মন্দিরের বাইরে রাখা কালো পাথরের মূর্তি ও গণেশমূর্তি সত্যিই সুন্দর। আর ২০ গজ দূরে রয়েছে একটি গণেশ মন্দির। পুজোর সময় বেড়াতে গেলে দেখতে পাবেন রাস্তার পাশে পাহাড়ের কোলে গাছ ভর্তি আতাফল। দুপুরে হোটেলে ফিরে ন্যাচারাল পাথরের টেবিলে এবং ন্যাচারাল ডাইনিং হলে বসে মধ্যাহ্নভোজ সেরে একটু বিশ্রাম করে কলকাতাগামী বাসের উদ্দেশ্যে বাস স্ট্যান্ডের দিকে রওনা হলাম। যথাসময়ে বাস এল। স্মৃতিচারণ করতে করতে ভারাক্রান্ত মনে বাবুঘাট পৌঁছলাম রাত্রি ১১টার সময়।

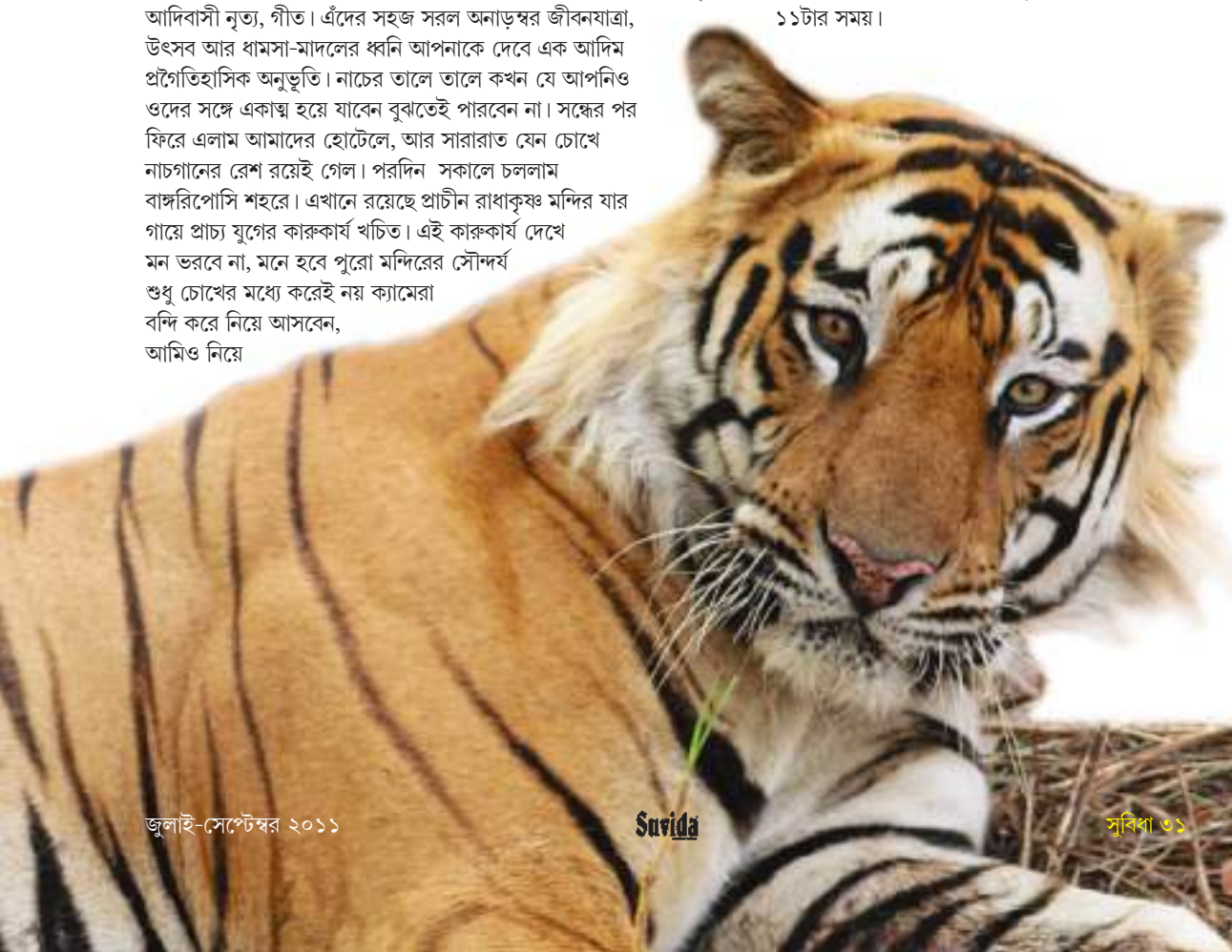

জরায়ুর ফাইব্রয়েড

জরায়ুর ফাইব্রয়েড বা টিউমার নিয়ে এখনও বহু মহিলার কোনও সঠিক ধারণা নেই। জরায়ুর টিউমার শুনলেই অনেকে ঘাবড়ে যান, ভাবেন নিশ্চয়ই তাঁর ক্যান্সার হয়েছে। যদিও চিকিৎসকদের মতে, এ ধরনের ফাইব্রয়েড বা টিউমারের ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা খুবই কম। জরায়ুর এই ফাইব্রয়েড কেন হয়? এর লক্ষণ কী? চিকিৎসাই বা কী? জরায়ুর টিউমার হলে কি সন্তান ধারণ সম্ভব? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ রত্নাবলী চক্রবর্তী।

জরায়ুর ফাইব্রয়েড বা টিউমার কী

ন্যাসপাতির আকারের ইউটেরাস বা জরায়ুর কাজ হল সন্তান ধারণ করা। ইউটেরাসে বা জরায়ুতে যে মাসল লেয়ার বা পেশিস্তর আছে সেই পেশি থেকেই তৈরি হয় ফাইব্রয়েড টিউমার। ইউটেরাসের ফাইব্রয়েড সাধারণত বিনাইন। অর্থাৎ এর থেকে ক্যান্সারের আশঙ্কা নেই বললেই চলে।

কাদের হয়

যে কোনও বয়সের মহিলাদেরই জরায়ুর ফাইব্রয়েড হতে পারে। ১৭-১৮ বছর বয়সে হতে পারে, আবার হতে পারে বয়স্ক মহিলাদেরও। তবে এটি মূলত রিপ্রোডাকটিভ এজ বা প্রজননে সক্ষম মহিলাদেরই সমস্যা। মহিলাদের শরীরে যখন স্ত্রী হরমোন ইস্ট্রোজেন কর্মক্ষম থাকে সেই সময়েই ফাইব্রয়েড হয়। তাই পিরিয়ড শুরু হওয়ার আগে এবং মেনোপজের পর ফাইব্রয়েডের সমস্যা থাকে না। যাঁদের জরায়ুতে ফাইব্রয়েডের অস্তিত্ব থাকেও, তাঁদের মেনোপজের পর তা ছোট হয়ে যায়।

লক্ষণ কী

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জরায়ুর ফাইব্রয়েড বা টিউমারের কোনও লক্ষণ বা উপসর্গ থাকে না। আসলে এই উপসর্গ অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভর করে এর অবস্থানের ওপর। ইউটেরাসের বাইরের দেওয়ালে হলে অনেক বড় আকার ধারণ করলেও রোগী বুঝতে পারে না তার ফাইব্রয়েড আছে।

জরায়ুর ভিতরে যে লাইনিং থাকে তাকে বলা হয় এন্ডোমেট্রিয়াম, যেটা থেকে প্রতি ২৮ দিন অন্তর পিরিয়ডের সময় রক্তক্ষরণ হয়—যাকে মাসিক বলা হয়। এই এন্ডোমেট্রিয়াম-এর সারফেস এরিয়া যদি ফাইব্রয়েডের জন্য বড় হয়ে যায় তাহলে হেভি ব্লিডিং হতে পারে। হেভি ব্লিডিং হতে পারে জরায়ুর রক্তের নালী মোটা হয়ে গেলেও। অর্থাৎ বলা যায়, অতিরিক্ত রক্তস্রাব হল ফাইব্রয়েডের একটি লক্ষণ। ইউটেরাসের মাসল স্ফিত হয়ে অনেক বড় হয়ে যায় গর্ভে সন্তান এলে। আবার এই মাসল গুলোরই সংকোচন প্রসারণের ফলে স্বাভাবিক প্রসব হয়। এই পেশীস্তরে টিউমার (ফাইব্রয়েড) হলে তাই বেশি মাসিক হওয়া বা মাসিকের সময় ব্যথা হওয়া স্বাভাবিক। অতিরিক্ত রক্তস্রাবের জন্য অ্যানিমিয়া হতে পারে।

- ফাইব্রয়েড ইউটেরাসের ভিতর দিকে হলে ইনফার্টিলিটি বা বন্ধ্যাত্ব দেখা দিতে পারে।
- টিউমারের জন্য মাসিকের সময় ব্যথা থাকতে পারে।
- ইউটেরাসের লাইনিং-এর ভিতরে টিউমার থাকলে অনিয়মিত ব্লিডিং হতে পারে।
- অনেক ক্ষেত্রে ফাইব্রয়েডের জন্য সন্তান ধারণের পরেও তা অ্যাবরশন বা গর্ভপতন হয়ে যেতে পারে।
- বড় ফাইব্রয়েড পেটে লাম্প হিসাবেও প্রথম লক্ষণীয় হতে পারে।

কোথায় হয়

জরায়ুর এই টিউমার ছোট সরষে দানার মতো একসঙ্গে অনেকগুলো হতে পারে। আবার ১টা অনেক বড় কুমড়োর আকারেরও হতে পারে। ইউটেরাসের চারপাশের আস্তরণের বাইরে অনেক সময় ফাইব্রয়েড হয়। এদের বলা হয় সাবসেরাস মায়োমা। এর কোনও লক্ষণ থাকে না।

ফাইব্রয়েড এর প্রকার ও আকার ভেদ

● ফাইব্রয়েড হতে পারে মাসলের বা পেশির মধ্যে। এরকম হলে হেভি ব্লিডিং ও ব্যথা হয়।
● জরায়ুর ভিতরের দিকে হতে পারে। এক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্লিডিং, হেভি ব্লিডিং ছাড়াও বন্ধ্যাত্বের সমস্যা দেখা দেয়।
● যদি জরায়ুর উপরের দিকেও ফাইব্রয়েড হয় তাহলে পেটে হাত দিয়েই এই ফাইব্রয়েডের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়।
● ফাইব্রয়েড হতে পারে জরায়ুর নিচের দিকেও-'সারভাইকাল ফাইব্রয়েড'। এটা হলে সহজে ধরা যায় না। আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করলে এই ফাইব্রয়েড ধরা পড়ে।

চিকিৎসা কী

জরায়ুর ফাইব্রয়েডের চিকিৎসা নির্ভর করে রোগীর বয়স, এর অবস্থান এবং উপসর্গের উপর।
যে সব রোগীর বয়স কম ও তাঁরা সন্তান ধারণে ইচ্ছুক তাঁদের ক্ষেত্রে ইঞ্জেকশন (Gnrh agonist) দিয়ে ফাইব্রয়েডটা ছোট করা হয়। কিংবা ভীষণ অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রেও ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে টিউমার ছোট করা হয়। ততদিনে শরীরে প্রয়োজনীয় হিমোগ্লোবিন তৈরির চিকিৎসা চলে। অ্যানিমিয়ার প্রবণতা কমে গেলে তখন ফাইব্রয়েড অপারেশন করা হয়।
● যে রক্তনালী ফাইব্রয়েডকে রক্ত সরবরাহ করে সেই নালীর মুখ ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে বন্ধ করা হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় ইউটেরাইন আর্টারি এমবোলাইজেশন। ফলে তখন আর হেভি ব্লিডিং এর সমস্যা থাকে না।
● আকার ছোট থাকলে ল্যাপরোস্কোপির সাহায্যে শুধু টিউমারটিকে বাদ দেওয়া হয়। একে বলা হয় মায়োমেকটোমি। ইউটেরাসের ভিতরে অর্থাৎ Cavity-র মধ্যে থাকলে হিস্টেরোস্কোপি (Hysteroscopy) দ্বারা বাদ দেওয়া যায়।
● টিউমারের আকার বড় হলেও যদি সেই মহিলা সন্তান ধারণে ইচ্ছুক থাকেন, এবং তাঁর বয়স কম হয়, তাহলে মায়োমেক্টমি করা হয়। ফলে জরায়ু ঠিকই থাকে। তাই সন্তান ধারণে অসুবিধা হয় না।
● যদি কারও অনেকগুলো টিউমার থাকে, কিংবা টিউমারের আকার অতিরিক্ত বড় হয়, এবং সেই মহিলার বয়স ৪০ এর বেশি হয় তাহলে অপারেশন করে পুরো জরায়ুটাই বাদ দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় হিস্টেরেকটমি।
● ছোট মাপের ফাইব্রয়েড অনেক সময় বয়স্কা মহিলাদের ধরা পড়ে। অপারেশনের পরিবর্তে ব্লিডিং স্বাভাবিক রাখলেই চলে। সেক্ষেত্রে শুধু প্রোজেস্টোজেন বা ইস্ট্রোজেন-প্রোজেস্টোজেন পিল দিয়ে কিছুদিন চিকিৎসা করা যায়।

আপনাদের প্রশ্ন থাকলে লিখে পাঠাতে পারেন। খামের উপর 'ডাক্তারের চেম্বার' লিখে দেবেন।
ঠিকানা : সম্পাদক, সুবিধা
প্রযত্নে : এসক্যাগ ফার্মা প্রাঃ লি,
পি ১৯২, লেকটাউন, তৃতীয় তল, ব্লক বি ; কলকাতা : ৭০০০৮৯
email : eskagpha@vsnl.com

অথবা যোগাযোগ করতে পারেন
ডঃ রত্নাবলী চক্রবর্তী
ফোন : ২৩৩৭-৪৯০১
১০টা থেকে ১টা

বিশেষ রচনা

মেয়েদের পুরুষ ভাবনা!

মেয়েদের নিয়ে ছেলেদের কল্পনার শেষ নেই। কত কবি কত কবিতা, গান, কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন নারীর সৌন্দর্য, নারীর আকর্ষণ নিয়ে। কিন্তু মেয়েরা পুরুষদের কেমন চোখে দেখে, তারা পুরুষদের মধ্যে কী খোঁজে তার খোঁজ আমরা কতটা নিয়েছি? মেয়েদের মনের কথা, তাঁদের মানস পুরুষ কেমন তাঁরা চান সেটা জানতে **অরিজিৎ দত্ত** কথা বলেন কিছু পরিচিত নারীমুখের সঙ্গে।

প্রেমিক ও বরে পার্থক্য নেই

পার্ণো মিত্র — আমার যে প্রেমিক হবে তাকে good personality-র হতে হবে, good sense of humour থাকতে হবে, দেখতে ভাল হতে হবে অবশ্যই। আর যেটা সব থেকে জরুরি সেটা হল ভাল মানুষ হতে হবে।

বর আর প্রেমিকের মধ্যে আবার পার্থক্য হয় নাকি? যে প্রেমিক হবে সেই তো পরে বর হবে। এভাবেই তো এগোনো উচিত। কারণ আমি আগেই decide করে নেব কে আমার প্রেমিক বর হবে।

প্রেমিককেই বর হিসেবে চাইব

মানালি — আমার প্রেমিক হবে অবশ্যই পক্ষীরাজে চড়া রাজপুত্র। সবাই যেমন রোম্যান্টিক প্রেমিক চায়। আমি খুব একটা রোম্যান্টিক নই, কিন্তু সে যেন হয়, আমাকে বোঝে, খুব understanding হওয়া চাই। আর বড় মনের মানুষ হতে হবে।
বিয়ে করিনি এখনও তাই ঠিক বলতে পারব না বর আর প্রেমিকের পার্থক্য কী। তবে যাদের বিয়ে হয়ে গেছে তাদের অনেককেই বলতে শুনেছি যে পুরুষেরা বিয়ের আগে এক রকম আর বিয়ের পর একরকম। আমার মনে হয় প্রেমিক আর বর একইরকম হওয়া উচিত। কারণ প্রেমিক যে হবে তাকেই তো ভবিষ্যতে বর হিসেবে চাইব।

প্রেমিক টেলিফিল্ম, বর মেগা

সন্দীপ্তা — সত্যি কথা বলতে প্রেমের মানেটাই আমি এখনও জানি না। আর প্রেমিক বলতে, পারফেক্ট কেউ হয় না। ঠিক-ভুল নিয়েই মানুষ। তাই ওইভাবে কোনও মাপকাঠি ঠিক করাটা সম্ভব না। Adjustment টা জরুরি, তবে প্রেমে পড়লে সেটা কোনও ব্যাপারই না।

বিয়েতে আমি একেবারেই বিশ্বাসি নই। তাই বর কেমন হবে সেটা কী করে বলব! যদি আমাকে বলতে বলা হয় বর আর প্রেমিকের মধ্যে পার্থক্য তাহলে আমি বলব যখন কেউ প্রেমিক থাকে তখন আমরা তার সঙ্গে অল্প সময় কাটাই। আর তখন সেই প্রেমিক তার best টা দেবার চেষ্টা করে। তাই সবটাই পজিটিভ মনে হয়। বিয়ে হয়ে গেলেই আমরা সব সময় এক সঙ্গে থাকি তাই চাইলেও সে তার নেগেটিভ দিকগুলো লুকোতে পারে না। তখন পুরো ব্যাপারটা একটা গতানুগতিক সম্পর্কে পরিণত হয়। প্রেমে কিন্তু তা হয় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে প্রেমিক হল একটা টেলিফিল্মের মতোন, আর আর বর হল মেগাসিরিয়াল।

প্রেমিকও যা, বরও তাই

প্রিয়াঙ্কা — প্রেমটা হল এককথায় মন ভাল করা ওষুধ। প্রেমে পড়লে খুব খুশিখুশি হয়ে যায় মন। ধৈর্য বেড়ে যায়। প্রেমিক মানুষটা কেমন হবে সেটা আগে যখন কল্পনা করতাম তখন মনে হত সেই best হবে। দারুণ handsome, বড়লোক আর যা যা হয় আরকি! এখন ভাবলে হাসি পায়। এমনিতে আমি ভীষণ অধৈর্য হয়ে পরি চট করে, রেগে যাই। তাই যে আমার প্রেমিক সে আমাকে সামলে রাখবে আশা করি। তার ভাল কৌতুকবোধ থাকতে হবে। ভাল মানুষ হবে, আর আমাকে গাইড করবে এই আশা করি।

বর আর প্রেমিক আলাদা কিছু নয়। সেটা আমার থেকে ভাল আর কে জানবে? আমার husband রাহুলকে আমি এক্ষেত্রে full marks দেব। ও খুব ভাল বন্ধু। প্রেমিক ও বর। তাই সবাইকে বলব প্রেমিক আর বর আলাদা কিছু না।

নিজের পরিবারকে যেন ভালবাসে

রিমঝিম মিত্র — প্রেমিক কেমন হবে সেটা

আমি আগে থেকে ভাবতে পারব না। কাউকে দেখে হয়তো ভাল লেগে যাবে। ঠিক জানি না।

বর তো পাইনি, তাই বলা মুশকিল বর আর প্রেমিক এক কিনা। আসলে আমি স্বাধীনতা চাই। তাই আমার পুরুষ যেন আমাকে স্বাধীনতা দেয়, তাই চাইব। দেখব সে তার নিজের family কে কতটা ভালবাসে। সে কতটা সহানুভূতিশীল সেটাও দেখতে হবে। কারণ এর উপর depend করবে সে আমার family বা আমাকে কতটা ভালবাসবে। এছাড়া বাকিটা অ্যাডজাস্টমেন্ট। আমি সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে হই হই করে থাকতে চাই, তাই সেও আমার মতো হবে সেটাই কাম্য। আর বর-প্রেমিকের মধ্যে পার্থক্যটাও বলা শক্ত। এটা এক এক মানুষের ক্ষেত্রে এক-এক রকম।

বর না প্রেমিক বড়

উষসী — প্রথম শর্ত আমার কাজের জায়গায় কোনওরকম 'দখল আন্দাজি' করবে না। তাকে জীবনের প্রতি honest হতে হবে, কারণ সে যদি নিজের জীবনের প্রতি সত্য না থাকে, তো আমার প্রতি honest থাকবে কী করে? এছাড়াও কেয়ারিং হতে হবে, বন্ধু হতে হবে। তার সঙ্গে সামাজিক হওয়াটাও জরুরি।

যা প্রেমিক, তাই বর। এই দুটো নামকে আলাদা করার কোনও মানেই হয় না। আর কোনও প্রেমের সম্পর্ককে 'বিবাহ' নামক কোনও প্রতিষ্ঠানের নাম না দেওয়াই ভাল। কারণ আমার মনে হয় তখন সম্পর্কের থেকেও প্রতিষ্ঠানটাকে বড় করে দেখা হয়। সেক্ষেত্রে প্রেমিক নামটাই সম্পর্কের নাম হতে পারে।

প্রেমিক থ্রিলিং, বর গতানুগতিক

সুচন্দ্রিমা — আমার প্রেম এসেছিল বন্ধুর ফর্মে। প্রথমে বন্ধুত্ব তার পর আস্তে আস্তে সেটা প্রেমে পরিণত হয়। যাই হোক যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে যে কেমন প্রেমিক চাই, তাহলে বলব এমন প্রেমিক চাই যে আমাকে বোঝার চেষ্টা করবে। আমার চাওয়া না চাওয়াটাকে গুরুত্ব দেবে। অবশ্য আমিও তাই দেব। এখানেই শেষ না। আমার কাজের ক্ষেত্রে আমাকে স্বাধীনতা দিতে হবে। একটা ভাল combination আর কি!

বর আর প্রেমিকের মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে বলে আমার মনে হয় না। তবে অনেকেই বলে পার্থক্য আছে। যেমন প্রেমিক ব্যাপারটায় বেশ একটা থ্রিল আছে। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করা, dinner-এ যাওয়া— এটায় একটা আলাদা মজা আছে। আর বর ব্যাপারটা একটা সময়ের পরে গতানুগতিক। যেমন বাবা-মাকে দেখেছি। এর বেশি তো কিছু জানি না। বিয়ে করলে বলব।

মুসলিম মহিলা আইন

‘মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রপার্টি বা সম্পত্তি’ সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ‘অল বেঙ্গল মুসলিম উইমেনস অ্যাসোসিয়েশন’ -এর প্রতিনিধিদের কাছে। তাঁরাই দিয়েছেন উত্তর ‘সুবিধা’র পাঠকদের সুবিধার্থে

প্রশ্ন : বাবার সম্পত্তির উপর অবিবাহিত মেয়ের কি কোনও অধিকার আছে?

উত্তর : আছে। শুধু অবিবাহিত নয়, বিবাহিত মেয়েরও অধিকার আছে তাঁর বাবার সম্পত্তির উপর। মেয়েরা ছেলের ভাগের অর্ধেক পরিমাণ পাবে, বিবাহিত হলেও, অবিবাহিত অবস্থায়ও।

প্রশ্ন : স্বামীর সম্পত্তির উপর স্ত্রীর অধিকার কতটা?

উত্তর : অবশ্যই আছে তবে স্বামীর জীবদ্দশায়, বা যতক্ষণ তিনি স্বামীর সঙ্গে ঘর করছেন, ততক্ষণ তাঁর আলাদা কোনও অধিকার নেই। তিনি অবশ্যই তার ভরণপোষণ ও নিজস্ব দরকারের জিনিস স্বামীর কাছে দাবি করতেই পারেন। তবে সম্পত্তির আইনি ভাগ পাবেন শুধুমাত্র স্বামীর মৃত্যুর পর। বেঁচে থাকা অবস্থায় নয়। মৃত্যুর পর স্বামীর সম্পত্তির ৮ শতাংশ স্ত্রীর হবে। তবে তালাক বা ডিভোর্স হয়ে গেলে নয়।

প্রশ্ন : ‘মেহের’ কথাটা মুসলিম বিয়ের সঙ্গে যুক্ত। এটা কী?

উত্তর : এটা হল সিকিউরিটি মানি বা নিরাপত্তা অর্থ। মুসলিম আইন অনুযায়ী মেহের ছাড়া নিকাহ বা বিয়ে সম্ভব নয়। বরের পারিবারিক অবস্থা, সামাজিক স্থিতি, নিজস্ব আর্থিক সঙ্গতির উপর নির্ভর করে মেহের কত হবে ঠিক করা হয়।

বিয়ের সময় যে ‘নিকাহনামা’ পড়া হয় তাতে মেহের কত হবে বলা থাকে। এই মেহের অনেকটা হিন্দুদের স্ত্রীধনের মতো। মেহের দেওয়া হয় স্ত্রীকে বা বউকে। বউকে দেখাশোনা করার বা সংসার চালানোর ক্ষমতা যে বরের আছে, মেহের প্রদান তারই প্রমাণ স্বরূপ। বিয়ের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ নিকাহ-র সময় প্রথমে বউ-এর মত নেওয়া হয়, তার পর বর তার বিয়ের ইচ্ছা এবং দায়িত্ব নেওয়ার কথা কবুল করে। মৌলবি বা মুসলিম পুরোহিত বিয়ের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। তিনি কোরাণ থেকে বিভিন্ন অংশ পড়ে

শোনান। বিয়ে সম্পন্ন হয় 'ইজাব-এ-কবুল' অনুষ্ঠান অর্থাৎ বর ও বউ-এর সম্মতি নেওয়ার পর। এরপর মৌলবি এঁদের দু'জনকে স্বামী-স্ত্রী বলে সবার সামনে ঘোষণা করেন।

প্রশ্ন : বিবাহিত মহিলা মেহের কখন দাবি করতে পারেন?
উত্তর : বিবাহিত মহিলাকে মেহের দাবি করতে হয় না। নিকাহ বা বিয়ের পর, স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগেই স্বামী তাকে মেহের দিয়ে দেন।

প্রশ্ন : কারও বর যদি তাঁকে তালাক দেন, তাহলে স্ত্রী কী কোনও টাকা, পয়সা পান তার কাছ থেকে? তাঁর সন্তানেরাও কি বাবার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন?
উত্তর : স্ত্রী শুধু তালাকের পর ৪মাস ১০দিনের জন্য ভরণপোষণ পাবেন। তারপর আর কোনও আর্থিক সাহায্য পাবেন না। স্বামীর সম্পত্তিতে তাঁর কোনও অধিকার থাকবে না। কিন্তু ছেলেমেয়ে বা ওঁর সন্তানেরা বাবার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে না।

প্রশ্ন : ছেলেমেয়ে বা সন্তানেরা যদি তালাকের পর মার কাছে থেকে মানুষ হয়, তাহলে কি ওদের ভরণপোষণের কোনও দায়িত্ব বাবার উপর বর্তায়?
উত্তর : মুসলিম আইন অনুযায়ী মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত ও ছেলেদের ক্ষেত্রে ১২ বছর পর্যন্ত সন্তানেরা মায়ের কাছে থাকবে। অবশ্য মা যদি ওদের নিতে অক্ষম হন বা না চান, কিংবা পুনর্বিবাহ করেন তাহলে, সন্তানেরা বাবার কাছেই থাকবে। মার কাছে থাকলেও মা কোনও ভরণপোষণ না পেলেও, ছেলে মেয়ের খাওয়া, থাকা, শিক্ষার জন্য বাবাকে অর্থ দিতে হবে। সে দায়িত্ব বাবার উপরই বর্তায়, মা যদি সন্তানদের নিজের কাছে রাখতে না চান, তাহলে তারা বাবার কাছেই থাকবে। এটা নিজেদের মধ্যেই ঠিক করে নেওয়া হয়।

প্রশ্ন : ডিভোর্স বা তালাকের পর ডিভোর্সি মা সন্তানদের উপর আইনি অধিকার কায়েম করতে পারেন কি?
উত্তর : অবশ্যই পারেন।

প্রশ্ন : ডিভোর্সি মার সন্তানদের বাবার সম্পত্তিতে কতটা অধিকার থাকে?
উত্তর : সন্তানদের পূর্ণ অধিকার থাকে।

প্রশ্ন : বাবা কি তালাকের পর সন্তানদের নিজের কাছে রাখতে পারেন?
উত্তর : ১২ বছর অবধি ছেলে ও ১৫ বছর অবধি মেয়ের উপর অধিকার মার। তবে মা যদি সন্তানদের রাখতে না চান তাহলে তারা বাবার কাছে থাকবে।

ঝিলিক-এর ঝলকানি

বছর চারেক বয়স থেকে শুরু হয়েছে অভিনয়। সিনেমা, সিরিয়াল চলেছে সমানতালে। মিঠুন চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, তাপস পাল। তালে তাল মিলিয়ে সংলাপ বলতে ভয় ডর ছিল না, কারও সঙ্গেই। কিন্তু বড় পর্দার যাবতীয় সাফল্য ছাপিয়ে গেল ছোট পর্দার ধারাবাহিকের মাত্র একটি চরিত্র। আপামর বাংলা মেয়েটিকে এক ডাকে চেনে। ঝিলিক। 'মা' ধারাবাহিকের প্রধান ও সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্র। পড়াশোনা আর অভিনয়ের চাপে সদা ব্যস্ত এই ছোট্ট অভিনেত্রীর সঙ্গে সামান্য সময় বের করে গল্প করলেন **প্রীতিকণা পালরায়**

● **ঝিলিক-এর আসল নামটা এখন কেউ জানে?**
না তো! বন্ধুরাও এখন ঝিলিক বলে ডাকে। আমার আসল নাম তিথি বোস।

● **তিথি কোন স্কুলে পড়ে? কোন ক্লাসে?**
জি ডি বিড়লা সেন্টার ফর এডুকেশন। ক্লাস সিক্স।

● **বাড়িতে কে কে আছে?**
মা, বাবা, ঠাম্মা আর আমি।

● **কে সবচেয়ে তিথিকে ভালবাসে? আর তিথি সবচেয়ে বেশি কাকে ভালবাসে?**
আমাকে তিনজনেই খুব ভালবাসে। আর আমি সবচেয়ে ভালবাসি বাবাকে।

● **প্রথম অভিনয় কোনটা?**
আকাশ বাংলা'র একটা সিরিয়ালে। নাম মনে নেই। অতি উত্তম সিরিজে কিছু টেলিফিল্ম করেছি। তবে বেশিরভাগ অভিনয়ই বড় পর্দায়। সুজিত গুহ-র 'এরই নাম প্রেম', প্রভাত রায়-এর 'প্রিয়তমা', স্বপন সাহার 'টাইগার', অনুপ সেনগুপ্তর 'মহাগুরু', 'সংঘর্ষ', শতাব্দী রায়-এর 'ঢাকি', আরও অনেক আছে, মনে পড়ছে না।

● **বিশেষ কোনও ঘটনা মনে আছে, এত বড় বড় স্টারদের সঙ্গে অভিনয় করতে গিয়ে?**
হ্যাঁ। 'বন্ধু' ছবিতে আমাকে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে সাজতে হয়েছিল। তখন আমার বড় বড় চুল কেটে 'boy's cut' করতে হয়েছিল!

● **'মা'তে সুযোগ পেলে কী করে?**
আমাকে 'মা'-এর জন্য কোনও অডিশন দিতে হয়নি। প্রডিউসাররা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন এই ধারাবাহিকটা হলে, আমাকেই 'ঝিলিক'-এর চরিত্রতে অভিনয়ের জন্য নেবেন।

● **তুমি তখন কোন class-এ পড়তে?**
ক্লাস ফোর।

● **ঝিলিক না তিথি বন্ধুদের মধ্যে কে বেশি জনপ্রিয়?**
আগে তিথি ছিল, এখন তো দেখি ঝিলিককেই সবার পছন্দ। সবাই বলে ঝিলিক বেশি ভাল।

● **তোমার নিজের কী মনে হয়? দু'জনের মধ্যে মিল কোথায়?**
দু'জনেই মা কে খুব ভালবাসে। সেটা সবচেয়ে বড় মিল। আর দুজনেই সবার জন্য ভাবে।

● **তুমি সবার জন্য কী ভাব?**
আমি ঝিলিকের মতো সবার জন্য না ভাবতে পারলেও, বন্ধুদের জন্য, বাড়ির সবার জন্য ভাবি। বিশেষ করে বাবা-মা কোনও problem-এ পড়লে, আমি চেষ্টা করি solve করতে।

● **সকালে উঠেই স্কুল, তারপর সোজা স্টুডিও। রাত অবধি শ্যুটিং- কখনও সারা রাত—কষ্ট হয় না? মনে হয়না অন্য বন্ধুরা**

কত আনন্দ করে থাকতে পারে?
মাঝে মাঝে মনে হয়। আবার মনে হয়, আমাকে সবাই এত ভালবাসে-একটু কষ্ট করি না! অনেক সময় ক্লান্তি লাগে, ঘুম পায়, আবার জোর করে নিজেকে ঠিক করি। কাজটা যখন করতেই হবে ভাল করেই করি।

● **সবাই বলে স্টুডিও'য় তিথি খুব সিরিয়াস। সেটা কি অভিনয় করতে খুব ভালবাসো বলে?**
হ্যাঁ। আমার ভালই লাগে অভিনয় করতে। তাছাড়া ওই যে মনে হয়, আমার কাজটা যেন সবার ভাল লাগে—কারও যেন কোনও অসুবিধে না হয়। তখন সিরিয়াস হয়ে যাই। একবার তো শীতের রাতে একটা সিন ছিল জলে ভেজার। কনকনে ঠাণ্ডায় ফাঁকা মাঠে চার-পাঁচটা হোসপাইপ দিয়ে সমানে ভিজিয়েছিল আমাকে। টানা shot দিয়েছিলাম।

● **এত কিছু সামলে পড়াশোনা করো কখন?**
স্টুডিওতেই ফাঁকে ফাঁকে পড়া করি। স্কুলে টিচাররাও খুব সাহায্য করেন। মাঝে মাঝে শুটিং-এর কারণে off হয়ে গেলে পড়া বুঝিয়ে দেন।

● **আর কোনও অফার পাও না?**
ওটা তো জানি না। বাবা-মা বেশি জানে। তবে অনেক সিনেমা, সিরিয়ালের জন্য বলে, কিন্তু আমার সময় কোথায়? পড়াটা তো করতে হবে।

● **তিথি কী খেতে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে?**
ভাত, ডাল, আলুভাজা।

● **ফেভারিট অভিনেতা-অভিনেত্রী কারা?**
আমির খান, ক্যাটরিনা কাইফ আর দীপিকা পাড়ুকোন।

● **ফেভারিট সিনেমা?**
থ্রি ইডিয়টস।

● **এত জনপ্রিয়তা, নাম-ডাক, তোমার মন ছুঁয়ে গেছে এমন কোনো ঘটনা আছে?**
আছে। একজন পেশেন্ট-এর দুটো কিডনিই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। নার্সিংহোম-এ শুয়ে আমায় দেখতে চেয়েছিলেন। আমি গিয়েছিলাম। এত আনন্দ পেয়েছিলেন, আমার অবাক লেগেছিল।

ছবি : গোপাল দাস

সুলুক সন্ধান

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ অঞ্জন চক্রবর্তী ও অমিত বর্মণের সঙ্গে কথা বলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের নানা পথের খোঁজ-খবর দিচ্ছেন **সৈকত হালদার**

প্রত্যেক মানুষের উচিত নিজের আয়ের একটা অংশ সঞ্চয় করা। সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয় ভবিষ্যৎ জীবনের নিরাপত্তা এবং অপূর্ণ সাধ পূরণের জন্য। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের জীবনে সঞ্চয় কিছুটা অন্যরকম এবং একান্ত জরুরি। বিশেষত বিধবা বা ডিভোর্সি কিংবা একলা থাকা মহিলাদের জীবনে সঞ্চয় ভবিষ্যতে বাঁচার একমাত্র পাথেয়। মহিলাদের টাকা পয়সা বিষয় বুদ্ধি বা জ্ঞান নিয়ে বহু পুরুষেরই সংশয় আছে। কিন্তু মহিলাদের সঞ্চয়ের ধাত যেন আপনা আপনি দিয়েছেন ভগবান। বহু মহিলাই সঞ্চয়টা সত্যিকারের ফলপ্রসূ করার পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে তেমন ওয়াকিবহাল নন। তাই বিনিয়োগের ব্যাপারে তাঁদের বহুক্ষেত্রেই স্বামী, বাবা বা ভাইয়ের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক মহিলার সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা ও জ্ঞান থাকা উচিত।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের জন্য পরিকল্পনা

আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ সঞ্চয়ের পর সেই সঞ্চিত অর্থ সঠিক স্থানে বিনিয়োগ করতে হয়। আপনার বিনিয়োগের সাফল্যের উপর নির্ভর করবে আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের আর্থিক নিশ্চয়তা। তাই খুব ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। দরকার সঠিক পরিকল্পনা। প্রথমে ঠিক করতে হবে, কী উদ্দেশ্যে আপনি টাকা জমাবেন ও খাটাবেন। যেমন ধরুন আপনি একা বা সপরিবারে কোথাও বেড়াতে যেতে চান, সেক্ষেত্রে আপনাকে স্বল্প মেয়াদি বা শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে। আপনি যদি ভবিষ্যতে বাড়ি বা সম্পত্তি কিনতে চান, তাহলে তার দামের উপর নির্ভর করে আপনার বিনিয়োগ হবে মিডিয়াম টার্ম ইনভেস্টমেন্ট। আপনার অবসরকালীন জীবনের জন্য যখন আপনি আপনার সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করবেন, তখন সেটা হবে লংটার্ম ইনভেস্টমেন্ট। ঝুঁকিবিহীন নিরাপদ প্রকল্প নিঃসন্দেহে ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, বিমা, সরকারি প্রকল্প- আর ঝুঁকি নিয়ে তাড়াতাড়ি লাভজনক বিনিয়োগের জন্য বাজারে ভাল ফান্ড বা স্টক দুষ্প্রাপ্য নয়। কিন্তু ভাল ফান্ড বা স্টক পেলেই সঙ্গে সঙ্গে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন না। অনেক ভাবনা-চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। সেজন্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগের আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

সঞ্চয়ের সহজ উপায়

ঝুঁকিহীন অর্থ বিনিয়োগের নিরাপদ ক্ষেত্র ব্যাঙ্ক ও ডাকঘর সঞ্চয় প্রকল্প। এক্ষেত্রে বিনিয়োগের সহজ উপায় হল :

● **সেভিংস অ্যাকাউন্ট :** আপনার লক্ষীর ভাণ্ডারের মতোই এই সেভিংস অ্যাকাউন্ট। মাসের শেষে হাতে যা রইল তা এই সেভিংস অ্যাকাউন্টে জমাতে পারেন। ন্যূনতম ১০০ টাকা দিয়ে খোলা যায় এই অ্যাকাউন্ট রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোয়। অ্যাকাউন্ট খুলে পাশবই নেবেন। তাতে জমা তোলার হিসেব থাকে, চেক বই পেতে আরও একটু বেশি টাকা রাখতে হয়।

● **রেকারিং ডিপোজিট :** এই প্রকল্পে মাসে মাসে একটা নির্ধারিত পরিমাণ টাকা জমা দিতে হয়। এক, দুই ,তিন বা পাঁচ বছরের জন্য টাকা রাখা যায়। নির্ধারিত সময়ের পর একসঙ্গে সুদ সমেত সমস্ত টাকা ফেরত পাবেন। সেটা আবার অন্য কোনও প্রকল্পে জমাতে পারেন।

● **ফিক্সড ডিপোজিট :** থোক একটা টাকা পেলে সেটা ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করে জমাতে পারেন। এই এককালীন থোক টাকা ১৫ দিন থেকে ১০ বছর পর্যন্ত রাখা যায়। মেয়াদ শেষে অনেক টাকা পাওয়া যায়। এই ডিপোজিট স্কিমে ম্যাচিওরিটি অনুসারে সুদের হার হয়। সুদের হার ৯.২৫% - ১০%। ৮-১০ বছরের জন্য হলে সুদের হার ৮%। ৫ বছর মেয়াদ পূর্ণ করলে আয়করের ৮০সি ধারায় ছাড় আছে।

● **কিষাণ বিকাশ পত্র :** এই প্রকল্পে ৮ বছর ৭ মাসে টাকা দ্বিগুণ হয়। বিনিয়োগের কোনও উর্ধ্বসীমা নেই। মিনিমাম অ্যামাউন্ট ৫০০ টাকা। আড়াই বছর আগে এই প্রকল্প থেকে টাকা প্রি ম্যাচিওর অবস্থায় তোলা যায় না। ট্যাক্স বেনিফিট শূন্য।

● **মান্থলি ইনকাম স্কিম (এম আই এস) :** সুদের হার ৮%। সময়কাল ৬ বছর। মিনিমাম অ্যামাউন্ট ১ হাজার টাকা। ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট সিঙ্গল অ্যাকাউন্ট-এর ক্ষেত্রে সাড়ে চার লাখ টাকা এবং জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট-এর ক্ষেত্রে ন লাখ টাকা। ট্যাক্স বেনিফিট শূন্য।

● **ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট :** সুদের হার হবে ৮%। সময়কাল ৬ বছর। মিনিমাম অ্যামাউন্ট একশো টাকা। ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট কোনও উর্ধ্বসীমা নেই। ট্যাক্স বেনিফিট আয়কর আইনের ৮০সি ধারায় আয়করের

ছাড় আছে।

● **পোস্ট অফিস রেকারিং ডিপোজিট :** সুদের হার ৭.৫%। সময়কাল- ৫ বছর। মিনিমাম অ্যামাউন্ট দশ টাকা ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট : কোন উর্ধ্বসীমা নেই। ট্যাক্স বেনিফিট শূন্য।

● **টাইম ডিপোজিট :** সুদের হার ৬.২৫-৭.৫% (এই সুদ বার্ষিক কিন্তু হিসেব হবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে) সময়কাল ১,২,৩,৪,৫ বছর। মিনিমাম অ্যামাউন্ট দুশো টাকা। ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট কোনও উর্ধ্বসীমা নেই। ট্যাক্স বেনিফিট শূন্য।

● **পোস্ট অফিস সেভিংস অ্যাকাউন্ট :** কমপক্ষে ৫০ টাকা দিয়ে এই অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। কিন্তু চেক-এর সুবিধা পাওয়ার জন্য নূন্যতম ৫০০ টাকা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। একজন একক অ্যাকাউন্ট হোল্ডার সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ টাকা এবং যৌথ অ্যাকাউন্ট হোল্ডার সর্বোচ্চ ২,০০,০০০ টাকা এই প্রকল্পে জমা রাখতে পারবেন।

● **সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস স্কিম :** সুদের হার ৯%। সময়কাল ৫ বছর। মিনিমাম অ্যামাউন্ট ১ হাজার টাকা। ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট : ১৫ লাখ টাকা। ট্যাক্স বেনিফিট শূন্য। বিনিয়োগকারীর নূন্যতম বয়স ৬০ বছর।

● **পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড :** সুদের হার ৮%। সময়কাল ১৫ বছর। মিনিমাম অ্যামাউন্ট ৫০০ টাকা। ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট ৭০ হাজার টাকা (বছরে)। ট্যাক্স বেনিফিট : সেকশন ৮০ সি অনুযায়ী আয়করের ছাড়।

ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলা

ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখার জন্য সেভিংস অ্যাকাউন্ট করতে হয়। এছাড়াও করতে পারেন কারেন্ট অ্যাকাউন্ট। এই অ্যাকাউন্ট একক, যৌথ বা অংশীদার হিসেবে করতে পারেন দুটি ক্ষেত্রেই অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে লাগে ১) প্যান কার্ড ২) সচিত্র পরিচয়পত্র ও ৩) পাসপোর্ট সাইজ ছবি।

এটিএম কার্ড : পুরো কথা Automated teller machine। এই কার্ড থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক থেকে যখন তখন টাকা তুলতে পারবেন। জানতে পারবেন আপনার অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স টাকা কত আছে। ইদানীং এটিএমএর অ্যাডভান্স পদ্ধতি ডেবিট কার্ড। এই কার্ডের মাধ্যমে যে কোনও ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে পারবেন ও ব্যালেন্স টাকার পরিমাণ জানতে পারবেন।

ক্রেডিট কার্ড : আপনার অ্যাকাউন্টে ভাল অঙ্কের টাকা থাকলে ক্রেডিট কার্ড করতে পারেন। এই কার্ডের মাধ্যমে পণ্য বা সামগ্রী কেনা যায় ধারে। পরে বিল এলে আপনাকে টাকা শোধ করতে হয়। এই খরচ করা টাকার উপর সুদের হার যোগ হয়।

সরকারি না বেসরকারি ব্যাঙ্ক

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের প্রশাসনে সরকার মনোনীত লোক থাকেন। কিন্তু বেসরকারি ব্যাঙ্কের (প্রাইভেট ব্যাঙ্ক/বিদেশি ব্যাঙ্ক) ম্যানেজমেন্টে সরকারি প্রতিনিধি থাকেন না। তবে এই জাতীয় ব্যাঙ্ককে C R R (ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও) এবং S C R রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জানাতে হয়, ফলে আপনি যে কোনও ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট করতে পারেন। অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের শাখা আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

পরের সংখ্যায় থাকবে আরও খবর।

ভূ ত ভ বি ষ্য ৎ

রাশিফল। আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র এই তিন মাস কার ভাগ্যে কী আছে জেনে নিন। লিখছেন শ্রীভৃগু (অনাদি)

মেষরাশি

নতুন কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি, কৃষি প্রধান ব্যবসায় সাফল্য পাবেন উচ্চশিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বিদেশ যাত্রার সম্ভাবনা। এম বি এ পাঠরত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে শুভ সময়। স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। হঠাৎ বিয়ে, তবে প্রণয় সূত্রে শুভ ফল পাবেন। শুভ সংখ্যা : ১, শুভরঙ : পিংক ; শুভ বার : সোম।

বৃষরাশি

মানসিক একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে, শেয়ার মার্কেটে অর্থ লগ্নি করণে শুভ ফল লাভ হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে বহু বাধার মধ্যেও সাফল্য আসবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে শুভ। চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে শুভ যোগ। অনেক বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পরও বিয়ে হবে। শুভ সংখ্যা : ৩, শুভ রঙ : সাদা; শুভ বার : শুক্র।

মিথুন রাশি

শিল্প এবং সাহিত্য চর্চায় যুক্ত ব্যক্তিরা বিশেষভাবে লাভবান হবেন; তবে চলচ্চিত্রে অর্থলগ্নি করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। লোহা ও গাড়ি ব্যবসায় শুভ ফল পাবেন। বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সাংসারিক জীবনে মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাবে। সন্তান ধারণের শুভ যোগ। শুভ সংখ্যা ২; শুভরঙ : সবুজ; শুভ বার : বৃহস্পতি।

ককর্ট রাশি

মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাবে, সেই চঞ্চলতার কারণে শিক্ষায় বাধাপ্রাপ্তি হতে পারে। দূর ভ্রমণ নিষেধ, বিশেষভাবে পাহাড়ি এলাকায়। জন্মস্থানের বাইরে বিয়েতে শুভ ফল লাভ হবে, স্বাধীন কাজে যুক্ত যাঁরা তাঁদের সময় ভাল। ধীরস্থির ভাবে অর্থলগ্নি করতে পারলে লাভবান হবেন। বিয়ের জন্য শুভ সময়। শুভ সংখ্যা : ৭ ; শুভ রঙ : কালো ; শুভ বার : সোম।

সিংহরাশি

স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখবেন। শরীরের নিম্নাঙ্গে অস্ত্রোপচার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। স্বাস্থ্যের কারণে পারিবারিক জীবনে অশান্তি বৃদ্ধি হতে পারে। সন্তানদের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। বিপদ আসতে পারে। আটকে থাকা টাকা পাওয়ার যোগ আছে। হঠাৎ ভালবাসার মধ্যে জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক। বিয়েও হতে পারে। শুভ সংখ্যা : ১; শুভ রঙ : হলুদ শুভ বার : বুধ।

কন্যারাশি

বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্র শুভ। ব্যবসা এবং কর্মজীবনের জন্য, শিক্ষার জন্য নয়। ডাক্তারি ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ শুভ। ভালবাসা বা প্রেমের ক্ষেত্রে বিপত্তি বা বাঁধার সম্মুখীন হতে পারেন অত্যধিক আবেগের ফলে ক্ষতি হতে পারে। চাকরিরত মহিলাদের সুযোগ বৃদ্ধি হবে কর্মক্ষেত্রে। বিয়ে হবে দেখেশুনে। বিয়ে হলে শুভ ফল লাভ হতে পারে। শুভ রঙ : ধূসর; শুভ বার : মঙ্গল।

তুলা রাশি

জন্মস্থান পরিবর্তনে কর্মজীবনে উন্নতি হবে। অর্থলগ্নি করবার আগে বিশেষভাবে সাবধানতা অবলম্বন করবেন। বিশেষকরে শেয়ারে এবং লোহা, জল জাতীয় ব্যবসায়, নতুনভাবে যোগাযোগ হবে। বিয়ে, সন্তান ধারণের ক্ষেত্রে বাঁধা আসতে পারে। মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে এবং অর্থসঙ্কট দেখা দিতে পারে। শুভ সংখ্যা : ৬; শুভ রঙ : সাদা; শুভ বার : বুধ।

বৃশ্চিক রাশি

রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা হঠাৎ লাভবান হবেন। ব্যবসায় উন্নতি লাভ ঘটবে। কৃষি প্রধান ব্যবসায় শুভ ফল লাভ হতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। রক্ত সংক্রান্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার যোগ আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ফল মনমতো নাও হতে পারে। বিয়ের ক্ষেত্রে সময় শুভ। বন্ধুর কাছ থেকে সাবধান। শুভ সংখ্যা : ৩ ; শুভ রঙ : হলুদ; শুভ বার : শনি।

ধনু রাশি

মানসিক অস্থিরতার কারণে শিক্ষায় ক্ষতি। মাতৃবিরোধ, ভালবাসার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। কারণ ভালবাসা থেকে শারীরিক এবং মানসিক ক্ষতি হতে পারে। উচ্চ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সময় শুভ। কর্মস্থান শুভ। স্বাধীন কাজে যুক্ত যাঁরা কর্মক্ষেত্রে বিশেষভাবে লাভবান হবেন। কর্মক্ষেত্রে মহিলারা বিশেষভাবে লাভবান হবেন। শুভ সংখ্যা : ৪; শুভ রঙ : সবুজ; শুভবার : সোম।

মকর রাশি

কর্মক্ষেত্রে সুযোগ পেয়েও, সেটা সুপরিণতি লাভ নাও করতে পারে। স্বাধীন কর্মে উন্নতি হবে। তৃতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। বিশ্বাস করলে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। তবে প্রণয় সূত্রে বিয়ে শুভ; পরধন প্রাপ্তি যোগ আছে। সন্তান এসে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ব্যবসায় উন্নতি লাভের সম্ভাবনা প্রবল। শুভ সংখ্যা : ৭; শুভ রঙ : সাদা; শুভ বার : সোম।

কুম্ভরাশি

মাসের শেষের দিকে উচ্চ পদলাভের যোগ আছে। নিকটাত্মীয়ের কাছ থেকে আঘাত প্রাপ্তি হতে পারে। যৌথভাবে ব্যবসায় শুভ সম্ভাবনা। চলচ্চিত্রে অর্থলগ্নিকারীরা বিশেষভাবে লাভবান হবেন। যাত্রা শিল্পীদের উন্নতির সম্ভাবনা কম থাকবে। তবে লোহা, চিনি, মাছের ব্যবসা শুভ হবে। বিবাহের ক্ষেত্রে নতুনভাবে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং সাফল্য আসবে। শুভ সংখ্যা : ৪; শুভ রঙ : আকাশি; শুভ বার : সোম।

মীন রাশি

একাধিক কর্মের মধ্যে দিয়ে উন্নতির যোগ প্রবল এবং ব্যবসায় আটকে থাকা অর্থপ্রাপ্তি হওয়ার যোগ আছে। যৌথভাবে অর্থলগ্নি করলে ক্ষতি হতে পারে। স্বাধীন কর্মে যুক্ত ব্যক্তিরা বিশেষভাবে লাভবান হবেন। তবে রক্তচাপ বৃদ্ধি এবং সুগার, লিভার সংক্রান্ত রোগে কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে যাওয়া শুভ। সাফল্য আসবে। শুভ সংখ্যা : ১; শুভ রঙ : নীল; শুভ বার : বুধ।

বন্যাই শুধু বর্ষার
একমাত্র অভিশাপ নয়

সঙ্গে আছে ডায়রিয়াও

হ্যাঁ, আপনার ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে দেখুন

Folcovit® Distab

Folcovit®

To be administered on the advice/under the supervision of a qualified Medical Practitioner

Suvida®

কারণ সিদ্ধান্তটা আপনার

গর্ভনিরোধক বড়ি

বিশদ জানতে হলে ফোন করুন ১৮০০ ১০২ ৭৪৪৭ (টোল ফ্রি) নম্বরে
অথবা মেল করুন eskagsuvida@gmail.com মেল আই ডি তে

স্বত্বাধিকারী সুনীল কুমার আগরওয়াল কর্তৃক পি ১৯২, লেকটাউন, তৃতীয় তল, ব্লক - বি কলকাতা ৭০০০৮৯ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড ১৩, ১৩/১ এ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০৭২ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক : সুদেষ্ণা রায়।